বেদনার্ত স্রোত

বাণিক রায়

অণিমা প্রকাশনী
১৪১, কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রীট
কলকাতা-৭০০০০৯

BEDANARTA SROT
By BARNIK RAY

প্রথম প্রকাশ : ১৯৬৩ জুন

প্রচ্ছদ : চারু খান

প্রকাশক : শ্রীদ্বিজদাস কর, অণিমা প্রকাশনী ; ১৪১, কেশবচন্দ্র সেনষ্ট্রিট, কলকাতা ৯
মুদ্রণ : শ্রীসুকুমার দে, বাসন্তী প্রেস, ১৯ এ, ঘোষ লেন, কলকাতা ৬

বেদনার্ত স্রোত

নদীর নীল জলের তীরে অরণ্য ছায়ায়

বাসুদেব : আমি সব কিছু নিয়েই আমার মধ্যে স্থির হয়ে আছি, কিন্তু অনুভবের ব্যাকুলতায় আমার চেতনার বিচিত্র আনন্দ , শান্তি পেয়েও তবু আমি ছুটছি ; এ কি স্বপ্ন !

প্রদ্যুম্ন : আমার মন অহংকার কর্ম নিয়ে আমি কী করবো, আমি যে সংহত হতে পারি না, শুধু উত্তেজিত করছে ; আমি তো অনেক জানি, এগুলির মধ্য দিয়ে আমার নিজের শক্তি এবং স্থূলতাকে পাই না ।

অনিরুদ্ধ : আমাকে শুধু জড়শক্তি বীভৎস করে তুলেছে, চেতনার অনুভব আসতে পারছে না । সুন্দর কিছুই দেখতে পাই না, আসে না, সুলতা !

সুলতা : আমার ছিন্ন সংবিতে আমি কিছুই ধরতে পারছি না, তাই সুখ নেই, আনন্দ নেই । আমি মিলে এক হয়ে থাকতে চেয়েছিলাম বাসুদেব ! কিন্তু আমি শুধু ক্ষুব্ধ, বিভ্রান্ত একা । আমার মধ্যে কারো প্রকাশ নেই । ভাখো, অরণ্যের ছায়া নদীর জলে পড়েছে, কী সুন্দর !

বার্ণিক রায়ের অন্যান্য বই

উপন্যাস

বিষণ্ণ বসন্ত, কালো গান, বাপ্পার জন্যে

নাটক

স্ফুলিঙ্গ, নীল বিষ, কয়েদখানা, সময়ের ভিড় (অ্যাবসার্ড)

নাট্যোপন্যাস

বাবুই, চক্ষুহীন বেদনা (অ্যাবসার্ড)

কাব্যগ্রন্থ

আনন্দের মর্মরিত অন্ধকার, নীল দুপুরের ভয়, শরীরের উদ্ভিজ্জ ছায়ায়, হে আমার মৃত্যু, উপবর্হন

অনুবাদ

এলিঅটের 'পড়ো জমি', স্যাঁ-জন্ প্যার্সের 'আনাবাস্'

আলোচনা

হ্বাগ্‌নের ও রবীন্দ্রনাথের গীতিনাট্য, কবিতা : চিত্রিত ছায়া, প্রতীক অরণ্য

ইংরেজি

Looking For An Address

The Fetid Pool

ইত্যাদি

প্রদ্যুম্নের ডায়েরি

সমস্ত জানালা দরজা বন্ধ। রাত্রি বারোটা বাজে। পাশে সুলতা ঘুমোচ্ছে। মাঝের দরজাটা বন্ধ। তবু ওর শ্বাস বাতাস ভেদ করে মশারি কাঁপাচ্ছে। পাশে কেউ নেই। আমার জন্যে জায়গাটা ভারি নোংরা করে শুয়ে আছে !

দম ফেটে বেরিয়ে আসতে চাইচে। অদৃশ্য চোরের ভয়ে দরজা খুলতে পারছি না। যে কোনো শিকই ভেঙে ফেলতে পারে। আমার চোখের সামনে নৃত্য করতে পারে ওরা। আমাকে নিয়ে যেতে পারে তুলে। ছাদ বা দেয়াল ফুটো করেও আমাকে নিয়ে যেতে পারে। তবু সান্ত্বনা, দরজা বন্ধ করলে আমাকে কিছু বলতে পারবে না। তাই দম ফেটে মরছি। বাইরের বাতাস আসতে পারছে না। জোর করে বন্ধ করে দিয়েছি। বাইরে বাতাস নেই যদিও। গাছের পাতা ঝিম ধরে আছে। অতিরিক্ত রৌদ্রে যেমন ঝিম ধরে থাকে, মনে হয় ক্রমপারম্পর্য নেই। পারম্পর্যহীন ঘটনা এবং অনুভূতিই সময়হীনতা। আমি ভাবছি, কথা বলছি, কথা বলছি, ভাবা ও কথা বলা যদি একই সময়ে হয়। হয় কি? হতে পারে। হতে না-ও পারে। কিন্তু আমি ভাবছি, আগে ভাবি নি, হয়তো ভাবনা থেকে বিরত ছিলুম, আবার ধরেছি, তাই এখন যোগ করছি। নাঃ। এ সব কি হচ্ছে! বড্ড বেশি গরম, জানালা খুলে দিই। কিন্তু ময়লা আসবে। গরমের সঙ্গে ময়লা সহ্য করতে পারবো না। সুলতা সুন্দর ঘুমোচ্ছে!

একটা চেয়ারে বসে আছি। ঢুলছি। চোখের সামনে নীরক্ত অন্ধকারের সমুদ্র স্তব্ধ হয়ে আছে। তরঙ্গ নেই। মনে হচ্ছে শাদা

সুন্দর নতুন দেয়াল চারটে কালো পাথরের বুকের মতো পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে মারতে চাইচে, পারছে না। ওদের বুকের নিশ্বাস স্তব্ধ, কালো জল হয়ে ঘরটার মধ্যে জমে আছে। আমি তার মধ্যে ডুবে আছি। আমার আলমারির বই, আমার শরীর, আমার সব কিছু ডুবে গেছে। আমি আমাকে চিনতে পারছি না। আমার হাতটা আমার চোখের সামনে ঘুরিয়ে দিলুম। কিছুই দেখতে পেলুম না। রবীন্দ্রনাথের গানটার মানে কোনোখানে খুঁজে পেলুম না, 'চোখের আলোয় দেখেছিলেম চোখের বাহিরে'। বড় কষ্ট হলো। বিদ্যাসাগরের মতো হলে কাঁদতুম। কিন্তু কান্না মানে পরাজয়। হাসলুম। হাসি বেরুতে চাইলো না। তবু জোর করে হাসলুম।

হঠাৎ দেখি ভেন্টিলেটারের মধ্যে দিয়ে একটা জোনাকি ঘরে ঢুকে পড়েছে! আমার চোখের সামনে অন্ধকারের চৌবাচ্চার ওপর তিলফুলের মতো আলো জ্বলছে ও নিভছে। ওই আলোর সঙ্গে আমার বুকের স্পন্দনটাও আন্দোলিত হচ্ছে। একই সঙ্গে নিভছে জ্বলছে। আমার শরীরের সমস্ত কিছু অন্ধকারে গলে মিশে গিয়ে শুধু নিরাবরণ হৃদ্‌পিণ্ডটা জোনাকির আলোর সঙ্গে নিভছে ও জ্বলছে। ওর সমস্ত নীল পেলবতা আমি আকর্ষণ করতে চাইচি। ওর দেহের মধ্যেই কেমন আলো জ্বলছে, আলো, সংগ্রহ করছে, আলো তৈরি করছে, আলো ক্ষয়িত হচ্ছে, তবু আলো তৈরি করছে, যতদিন বাঁচবে, ততদিন অন্ধকারের বুকে নীল আলোর গন্ধ স্নিগ্ধতা জাগিয়ে উড়বে। হায়রে, চোখটা থাকতেও এমন কেন জ্বলে না?

আমাকে বেড়াতে যেতে হলো। অন্ধকার রাত্রে বৃষ্টি-ভেজা আকাশের শীতল বাতাসের পালে শ্বাস ফেলে নৌকো করে আমাকে যেতে হলো।

আমার মনের মধ্যেও ইচ্ছে ছিল। তবু যেতে চাইছিলুম না। স্নিগ্ধ নীল আকাশে শাদা আলোর তরল বিন্দু জমে আছে, তারি ছায়া পড়েছে ছোট নদীর স্তব্ধ নরম কালো পাথর জলে। জলের শরীরের গভীরে ঢুকে গিয়ে নদীর হৃদয়ের জটিল অরণ্যে স্থির হয়ে বসেছে, চুপটি করে ভালো মেয়ের মতো চোখ বুজে আছে। আকাশগঙ্গার শাদা পথ জলের মধ্যে মেয়েদের শাদা কাঁচুলির আবরণ এনে দেয়। অসংখ্য নরম শাদা আলো জলে ঢুকে বসে আছে, কাঁপনে গলে গলে জলে মিশে যাচ্ছে। দুলতে দুলতে নৌকো এগোচ্ছে, কালো জলের ভাঁজ পড়ছে, ভাঁজের মধ্যে আলো দুলছে। আকাশে কোনো মেঘ নেই। আকাশগঙ্গার ঝাপসা পথে দূরে দূরান্তরে কান্নার জমাট অশ্রুর মতো গায়ে এসে পড়ছে। সুলতা গান গাইছিল। স্বচ্ছ বাতাবরণের ওপরে গানের ধ্বনির আলো কাঁপতে কাঁপতে নীল রঙের তরল আগুন জ্বালিয়ে দিলো। মনে হলো, সুলতা ও আমি তারি মধ্যে ঝিনুকের নরম আবরণে জড়াজড়ি করে শুয়ে পড়ে আছি। একটু কাঁপতেই এই আমেজ নষ্ট হয়ে যায়। তাই কথা বললুম না। সুলতা কথা বলতে চাইলো। ওকে থামাতেই অভিমানে চুপ করে গেল। ছইয়ের একপ্রান্তে ঠেস দিয়ে শুয়ে চোখ বুজে পড়ে রইল। নৌকোর দুলুনির সঙ্গে একটি লঘু রঙিন পদার্থ দুলছে।

নদীর স্রোতে নৌকো ভেসে চলেছে, পাড়ের গাছপালা নেই, দেখা যাচ্ছে না, গাছপালা কোথাও ক্যামেরার মতো ছবি ফেলেছে, নিস্তব্ধ হয়ে চুপটি করে ঝিমিয়ে আছে। গাঢ় অন্ধকার, আকাশে তারা, তারার আলো জলের ওপর নরম প্রদীপের মতো গলে মিশে যাচ্ছে, শুক্রটা চাঁদের মতো জ্বলছে, বৃহস্পতি দীপ্ত, কালপুরুষ উঠছে, যম শোভা পাচ্ছে, আকাশের ছায়াপথ অস্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে, তরল গতির মধ্যে নৌকোর স্রোত, জলের ঠাণ্ডা হাওয়া আসছে, মাঝির বৈঠাতে জলের শব্দে নৌকো দুলছে, কালো জল ভাঙছে, ছিটকে আলো ঝরছে। স্রোতের অন্ধকারে স্রোত ভেসে যাচ্ছে, অনন্তকাল ধরে বয়ে চলেছে, আকাশে

জেমিনি তারার মতো তারার সঙ্গে ঘুরছে। অন্ধকার নদী, স্রোত স্তব্ধ জলের তরল স্রোতে ফুল ভেসে যাচ্ছে, মরচে রঙের ফুল দুমড়ে যাওয়া-গোলাপ, শ্মশানের কালো অঙ্গার, পাড়ের গাছগুলি কালো অন্ধকারে নদীর স্রোতে অন্ধকার মিশে যাচ্ছে, সবটা স্তব্ধ স্রোত, জেলে ডিঙিতে আলো জ্বলছে নিভছে, মোচার মতো নৌকোয় দূরে একটা নরম শাদা আলো কাঁপতে কাঁপতে জলে পড়েছে, নৌকো চলেছে, দক্ষিণের দিকে পুবে পশ্চিমে সব কেমন গলে মিশে গেল।

নদীর গভীরে কত জটিল জলীয় শীতল সজল গাছেরা মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে চুপটি করে। স্রোতে একটু ঝুঁকে মাটিতে শেষ হয়ে যায়। বালি ধুয়ে শাদা শরীর জাগছে। জলের মধ্যে জটিলতা। সেই জটিল অরণ্যে জমানো অশ্রুর কান্না জলে স্নান করে পবিত্র হয়ে চুপটি করে বসে আছে, পাশের অন্ধকার গভীরতর করে তোলে।

কালো জলে স্রোতের চিহ্ন নেই। তবু চুলের রেখায় গতির ধারা বয়ে চলে। আলো কাঁপছে। এই মুহূর্তে এখানে দেখছি, পর মুহূর্তে নেই, স্থানের সীমায় দেখছি অন্যত্র উধাও। কিন্তু স্থানটাকে বাদ দিয়ে শুধু কালো জলের আলোয়-কাঁপা চুলের রেখার গতি দেখলে চলাটা ছাড়া আর কিছু নেই এবং শুধু চলার দিকটা স্তব্ধ বুঁদ হয়ে আছে, স্থির হয়ে আছে, গতির সঙ্গে আমার গতি মেলালে গতির সমস্যা চুকে যায়, আলাদাভাবে দেখলেই সমস্যা বাড়ে। কিন্তু এই স্রোত এসেছে কেন, কিভাবে এগোচ্ছে, কোন হেতুর দ্বারা এগোচ্ছে, কার্যকারণ সম্পর্ক কি। কোনো কার্যকারণ সম্পর্ক নেই, নূতন কিছু হচ্ছে না, নতুন থেকে আসছে না, অথচ পুরাতনকে ভাঙতে পারছে না। স্রোতটা একান্তই পুরাতন। শুধু স্থির হয়ে আছে স্রোত, চলার মধ্যেও স্থির। সেই স্থির-চলার মধ্যে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারছি না। স্থানে কালে স্রোতটা ভাঙছে গড়ছে রূপ নিচ্ছে। কালো জলে শাদা বরফ কুচি জাগছে, তারপর শেষ হয়ে যায়। হালের আঘাতে কালো জলে শাদা বরফ ভাঙছে, স্রোত থেমে যাচ্ছে, শাদা রূপের স্তূপে আন্দোলন ও

আলোড়ন জাগছে অনবরত। বস্তুহীন শক্তির অন্তরে গতিই স্রোতে প্রত্যক্ষ হয়ে উঠছে এখন।

এই গতিকে স্রোতকে কিভাবে সামনে এক করে স্থির ঐক্যে পাওয়া যায়? স্থূলতা গান ধরেছে, ধৈবত গান্ধার একাকার হয়ে গেল, তবু একটার পর একটা আসছে, ক্রমান্বয়ে তরঙ্গ তুলছে, কিন্তু ক্রমপারম্পর্য সব একাকার করে কিভাবে পাওয়া যায়। দুই স্থানের দূরত্বকে কিসের দ্বারা পূর্ণ করা যায়, দুই সময়ের মধ্যবর্তী অতল গহ্বরকে কি ভাবে পূর্ণ করা যায়। স্মৃতির পূর্ণ রূপ বর্তমানে নেই, বর্তমান স্মৃতি হতে গিয়ে বর্তমানের সব কিছু পাচ্ছে না, ভবিষ্যতের মধ্য দিয়ে এর রূপান্তর ঘটেছে। কিন্তু রূপান্তর, ক্রমান্বয়ে গতির চলা, সকলের মধ্যেই স্রোত। এই স্রোতটা রয়েছেই, এটাই নিত্য। পেছন থেকে কে যেন ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে, পেছনের জল আছে বলেই সামনের জল এগোচ্ছে, সামনের জল ধাক্কা দিচ্ছে। কিন্তু সর্বপ্রথম পেছনের জলটাকে কে তৈরি করেছে, সেটাকে কে ঠেলে দিয়েছে। আমি মাঝখানের অবস্থাটা জানি। সামনেটা ও পেছনেরটা শুধু অনুমান করতে পারি। এই অনুমান সত্য হতেও পারে, না হতেও পারে। শুধু মাত্র সম্ভাবনার ওপর ভর করে জীবন চালাতে হচ্ছে। কিন্তু সম্ভাবনার মৃত্যু প্রতি মুহূর্তে ঘটছে। তাই পূর্ণ করে সমস্ত স্রোতটাকে আমি এক করে পেতে চাই। কেমন করে একাকারভাবে এই স্রোতটাকে লাভ করবো। এতে অতীত ভবিষ্যৎ বর্তমান মিলে মিশে গলে একাকার হয়ে থাকবে।

সময়টাকে আমি হাতের মুঠোয় জলে-ধোয়া জমাট অশ্রুর শাদা আলোর তারার মতো পেতে চাই। নতুবা আমাকে মিশিয়ে দিতে চাই ওই স্রোতের মধ্যে। কিন্তু আমার স্মৃতি চিন্তা কর্ম জ্ঞান সব কেমন আলাদা করে রাখছে। সময় জঞ্জালের মতো মানুষের দেহগুলি স্রোতে ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, তীরে আঘাত করছে, মারছে, চূর্ণ-বিচূর্ণ করছে, রক্তাক্ত দেহের সব স্রোতে আলো জাগাচ্ছে, রক্ত মিশে গিয়ে স্রোতের তাপ বাড়িয়ে দেয়। আকাশের বুকের জমাট তারা স্রোতের জলে

ভাসছে, গলে মিশে যাচ্ছে একেবারে।

সময় নেই। অথচ স্রোত আছে। স্রোত আছে, অথচ সময় নেই। কিন্তু সময়ই স্রোত। পরিবর্তনই স্রোত, এই স্রোতই সময়। এই স্রোত আমাদের ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে, শ্মশানের ভস্মীভূত অঙ্গারের মতো সময়ের স্রোতে ভাসছি, তীরে তীরে ঘা খাচ্ছি, হয়তো একদিন অণু পরমাণুতে ভেঙে শক্তির সঙ্গে স্রোতে মিশে যাবো। কিন্তু তার আগে রূপের বেদনায় শুধু আঘাত খেতে হবে। পরিবর্তনের স্রোত হোক, অথবা পরিবর্তনরূপের পরমের প্রকাশ হোক, এর কোনো মূল্য আমার কাছে নেই। সময়কে পরমরূপে স্বীকার করলে, তার গর্ভ থেকে আমার জন্ম স্বীকার করলে, আশা থাকে, একদিন হয়তো মাতৃগর্ভের ঘন অন্ধকারের মতো আবার ফিরে যাবো। সেই রক্তবিন্দুর মধ্যে আপন স্বরূপের বেদনার কান্নায় মিলিত হবো। আসলে আমি স্বরূপে যেতে চাই। চাই কিন্তু পাই না। তাইতো বিচ্ছেদের বেদনা আমাকে মেরে ফেলে। সময় ও স্থানের দুরন্ত সমুদ্রের উত্তালতাকে আমি নিজের মধ্যে নেবো, অথবা তাকে ভাঙবো।

লোকটা চলতে চলতে এক জায়গায় গিয়ে থেমে গেল। জলটা উথলে উঠলো হঠাৎ। কালো স্রোতের বেদনার গতি ভেঙে আলাদা হয়, পাথরের মতো রূপ জাগিয়ে বসে আছি। সময়কে পেতে গিয়ে বসন্তকে হারিয়েছি। সুলতা মাথায় জল দিচ্ছে। সারা কাপড় ভিজে গেলো। ভেজা স্তব্ধ আকাশের বেদনা তারার মালা আলোর আভা জাগাচ্ছে ওপরে, তার স্থির রূপের প্রত্যক্ষ আনন্দ নেই। সুলতা কথা বলছে না। মাঝি নৌকো বাঁধতে চাইচে। সুলতা কি করবে ভেবে পাচ্ছে না। আমার কথায় নামবে কেন, কেননা, ওর কথায় আমি সায় দিই নি, কিন্তু আমার কথায় সায় না দিলে চার দেয়ালের আড়ালে আকাশকে ঢেকে যে নীড় গড়েছি, তাতে যাওয়া যায় না। তাই দুটি বিচ্ছিন্ন বস্তুর কঠিন আঘাত জলের স্রোতে তীরে প্রচণ্ড শব্দে দুমড়ে পড়ল।

সারাদিন পরিশ্রমের পর একা বসে আছি। জড়ের মতো বসে আছি একা। আমার মধ্যে যে প্রাণের খেলা চঞ্চলতার আলোড়ন আছে, তাকে কিছুতেই প্রকাশ করতে পারি না। নিয়মমাফিক খাইদাই অফিসে যাই, লোকের সঙ্গে কথা বলি, অর্ডার দিই, জিপে চড়ে বাড়ি আসি, সুলতার টেরিলিনের শাড়ির বহর দেখি, চুলের সাজ দেখি, পায়ের ও হাতের নখে শাদা নেলপালিশের রুক্ষ শুভ্রতা দেখে গান শুনি, গ্রামোফোন বাজাই, সুলতা গায়ে পড়লে তাপ অনুভব করি, রাত্রের তাপে তাপ মিলে যায়, রাগ করে কাঁদে, ঝগড়া করে, তেজে মাথা ঘোরায়, চুল ওড়ে, খায় না, তছনছ করে, আমি দেখি, সবই করি। এমনিভাবেই দিনরাত্রির স্রোতে ভেসে চলেছি। রাত্রির অন্ধকার আমার চোখের নীচে জোনাকির নীল স্নিগ্ধ আলো-জ্বলে, সেই আলো-জ্বলা অন্ধকার স্রোতে ভাসতে ইচ্ছে করে।

একা বসে থাকলেই চিত্রগুলি ছায়াবাজির মতো আমার বদ্ধ চোখের ওপর ভেসে বেড়ায়। লোকগুলি খেতে পাচ্ছে না, কাজ করতে চায় না, অফিসের কাজে ফাঁকি দেয়, ধর্মঘট করতে কাকে ঠেঙিয়ে মেরেছে, কাকে চুল ধরে নিয়ে গেছে, পুলিশ চাল সংগ্রহ করতে গিয়ে নিজের ঘরেই চাল মজুত করছে, ভগ্নীপতি ও স্বামীর সঙ্গে বিবাদ, মাঝখানে একা একটি চাষি মেয়ে কাঁদছে, নাটক করতে গিয়ে কার সঙ্গে প্রেমের কলহ হয়েছে, যুগীরা পণ্ডিত হয়েছে, জোর করে ব্রাহ্মণ বলে বিয়ে করেছে, মুচিদের পায়ে হাত দিয়ে ব্রাহ্মণ প্রণাম করছে, বিচারকেরা বিচার করতে গিয়ে ঘাড়ে চেপেছে, বাড়িঅলা ভাড়াটেদের মারছে, ধর্মের নামে সন্তোষ ও তৃপ্তি, ব্যাবসা করে পয়সা তুলছে, চীন সমর্থন করছে, চারতলা বাড়ির মালিক লেনিনের নেতা হয়েছে আজ, অফিসে

মেয়েকেরানিগুলি কেমন কাজ করছে, শরীরে কিছু নেই, তবু মুর্গির পালক আছে, কাচা-কাপড় ঝাঁপিয়ে তুলে পালক তৈরি করে। একটা কুষ্ঠগলিত ভিখিরি মেয়েছেলে একেবারে উলঙ্গ হয়ে সদর রাস্তায় পা হেঁচড়ে টেনে কাঁদছে, ভিক্ষা করছে, একটা সুন্দর মিষ্টির দোকানের সামনে রাত্রির অন্ধকারে তীব্র চিৎকারের করাত টানছে, দিনের বেলা উলঙ্গ হয়ে সকলের সামনে অর্ধেক ক্ষয়ে-যাওয়া-পা ময়লা ন্যাকড়া দিয়ে হাত ও মুখ লাগিয়ে বাঁধছে, তারপর এগিয়ে যাচ্ছে, কোনো দ্বিধা নেই, খাবার না পেলে চিৎকার করে কাঁদে, লোকটা মরতে পারে না, মরবার শক্তিও নেই, সেটাও ভদ্রলোকের জন্যে, কালা, পরের কথা শুনতে পায় না, নিজের প্রয়োজনের কথা ভুলে যেতে পারে না, জল ঘুলিয়ে চিৎকার করতে পারে, জন্মাচ্ছে, মরছে, মাথা ফাটিয়ে দিয়ে ডাক্তারের সার্টিফিকেট নিয়ে মড়া নিয়ে যাচ্ছে, সময় বাড়ছে, বাড়ছে না, একই ভাবে চলছে, তার মধ্যে গাছ জন্মাচ্ছে, মরছে, ঝরে পড়ছে, ছেলে যুবক হচ্ছে বিয়ে করছে সন্তান উৎপাদন করছে, মরছে, শেষ হয়ে যাচ্ছে, কাজ করছি এবং করছি না, দুয়ের মধ্যে ফারাক নেই, কাজ না করলেও মরতে হবে, কাজ কবলেও মরতে হবে, টাকা উপায় করলেও সম্মান পাওয়া যায়, না করলে সম্মান পাওয়া যায়, এত চেষ্টা এত প্রচেষ্টা এত কলহ এত গড়াপেটা সবই শূন্য, তবু করছে, তবু লোক চুরি করছে, সমস্ত বিভাগ থেকে চুরি হচ্ছে, শাদা আলো চেতনা হয়ে পড়েছে, কালো ছায়া পড়েছে ওপরে, একটা ছবি তৈরি হয়, সূর্য সরে যেতেই ছবি নষ্ট হয়ে যায়, এ ছবি আমার চোখে ধরা পড়ে না, জীবনের কোনো অর্থ নেই, প্রেম শুধু মাত্র আকাঙ্ক্ষা, মরে যাওয়া সেটাও আকাঙ্ক্ষা, চলে যাওয়ার মধ্যে অর্থহীনভাবে এগিয়ে যাওয়াই সত্য, এর মধ্যে যত অর্থ সবই ব্যক্তিকেন্দ্রিক। না, তবু আমি আছি আমি চাই, এবং সুলতাকে, শূন্য করে পেতে চাই, বিচ্ছিন্ন ছবির স্রোতকে থামিয়ে একক করে পেতে চাই সুলতাকে, এই আমার অভাব, তাই আমার দুঃখ। দুঃখের সাধনা নয়, ওটা ন্যাকামি।

স্ত্রী সম্বন্ধে একটা সন্দেহজনিত আকর্ষণবোধ বা নতুন করে সন্দেহ আরোপ করে একটা তীব্রতা অনুভব করা এযুগের চ্যাংড়া লেখায় প্রায়ই দেখি। জানি না, ফরাশি সাহিত্য মারে কি না। সাহিত্য পড়তে আমার ভালো লাগে না। কারণ চ্যাংড়াগুলো সাহিত্যের নামে কল্পিত অবস্থাকে স্বীকার করে। এবং তাকেই মনে করে চরম অস্তিত্ব। নতুবা বিকারের তীব্রতর অংশটা স্বীকার করে তার শিহরনটাকে ফলিয়ে প্রকাশ করা ধর্ম মনে করে, তাকেই নানাভাবে প্রকাশ করে। আর কেউ চলন্ত মেঘের আলোর রঙটাকে ধরে দিতে চায় শুধু। চিরস্থায়ী বোধের কোনো চিহ্নই দেখি না। হায়রে, চিরস্থায়ী কোনো বোধ আছে যেন, দেখি না নয়, পাই না। কিন্তু পাই না কেন? নেই বলেই কি? নেই বলে কি আনতে হয় না। কি হয় এ নিয়ে, মাথা ঘামাবার ব্যাপার নেই। ওতে কোনো চিরন্তন আনন্দ পাওয়া যায় না। যদি বুঁদ হতে হয়, তাহলে কবিতা বা জ্ঞানে নয়, মদেও নয়, মিস্টিক রহস্যে, নিস্তব্ধ নির্বাকত্বের মধ্যেই সেটা পাওয়া যাবে। সেখানে কথাসংগীতধ্বনি ইমেজ কন্‌সেপ্ট আইডিয়া আলোড়ন কম্পন আভাস বেদনা সব শেষ হয়ে যায়। এই লয়টাকে আমি পেতে চাই। যেখানে চেতনা আছে, অথচ চেতনার সংগ্রাম নেই, কারণ প্রকাশ নেই। তাই সাহিত্য পড়তে আমার খুব খারাপ লাগে। আর জীবনে এই খণ্ডাংশের বেদনার চেয়ে আরো বেদনা আছে, সে বেদনা আরো তীব্রতর, আরো গভীরতর। এবং যারা সাহিত্য করে তারা এর কিছুমাত্র জানে না। কারণ জানবার কৌতূহল নেই। অন্ধকার রাত্রে আকাশের মরণ আলোয় মাকড়শার জালবোনার মতো কত সূক্ষ্ম অনুভূতি চেতনায় বয়ন করে চলছে, তাকে কিভাবে

প্রকাশ করবো, জলের গভীরে জলের শরীরের নগ্ন নাচে যে জ্যোতি-পুষ্পের আলোয় মরণের আহ্বান জাগে, তাকে কিভাবে প্রকাশ করবো, আমার মাথার খুলিতে যে কত রক্তের স্রোত নাড়ির জটিল গ্রন্থির শ্বেতকণা লোহিতকণা হাড়মাস জড়িয়ে একটা গভীর গোপন রহস্যের যন্ত্র কাজ করে চলেছে, তাকে কিভাবে হাতের মুঠোর মধ্যে নেবো। আসলে স্পষ্ট প্রত্যক্ষ আলো নেই। আলোর মধ্যেও ঝাপসা আছে। তাই যারা সাহিত্যে শুধু পরিষ্কার কথা বলে, তারা বোঝে বলে আমার বিশ্বাস নয়। জীবনটা জটিল, শুধু জটিল নয়, দুর্বোধ্য। পাড়ার মাঝবয়সী ছোকরা যে সাহিত্য বোঝে না, হাত গুটিয়ে পরিষ্কার আলোর কথা বলতে পারে, তাকেই মার্কসীয় সমঝদার বলি। কারণ মানবের জন্যে তার অপার করুণা, তাই গুণ্ডাদলের ছোক্‌রাদের হাতে রেখে মার্কসীয় সাহিত্য দর্শন প্রচার করে। এরা আবার আমাকেও বোঝায়, সাহিত্যসভাতে নিয়ে যাবার চেষ্টা করে, আরো যারা উদ্যোগী তারা আমার কাছে লেখা চায়।

এক কালো চোয়ালবিশিষ্ট হেড়ে গলার এন্‌. সি. সি. অফিসার আসে, আমার কাছে আসবার কোনো কারণ নেই; নেহাং. ওর চেয়ে মর্যাদা বেশি, তাই হে হে করে হাসে, আমার কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে, হাই উঠলেও যেতে পারে না। স্ত্রীকে সঙ্গে করে নিয়ে আসে, সস্ত্রীক কি যে গল্প করে, কি সূত্রে যে আমার কাছে আসে জানি না, কিন্তু আসে, শুনেছি কলেজে নাকি পড়ায়, তাও জানি না, হয়তো রাষ্ট্রবিজ্ঞান, নয়তো বাংলা, কিন্তু বেশ আছে। কিন্তু এন্‌. সি. সির লোকটা আমার কাছে রোজ আসে, রাত্রে দু ঘণ্টা কাটায়, আমি না থাকলেও আসে, সকালে বাজার করে, প্রিন্সিপ্যালের বাড়ি ধর্না দেয়, সকাল বেলা ক্লাশ থাকলে চলে যায়, ক্লাশ কি নেয় জানি না, এন্‌. সি. সি. প্যারেড করে, খাতা লেখে, বাড়ি আসে তারপর আবার বেরোয়, পড়ে কখন! না, পড়বার দরকার হয় না, দুর্বল মুহূর্তে ওর সুপিরিয়র অফিসার সি. সি. আর. ভাল লিখলেই পদোন্নতি হবে। বাবার কথা মনে পড়ে।

আর একজনের স্ত্রী কেশেছে, তার কফমাখা চাদর হাতে করে কাঁধে নেয়। আমি দেখছি কাদার মধ্যেই পদ্ম ফোটে ভালো, ওদের ভেতরে কাদার সংগ্রাম, তাই গায়ের হাসি শাদা।

এরাও আমাকে সাহিত্য বোঝায়, এবং বেকেটের কথা বলে। বেকেট কোন বেকেট বললে মাথা চুলকোয়, ছবির আলোচনা করে, গান গাইতে উদ্যোগ করে, স্ত্রীকে বলে তুমি একটু গাও না, আমি কি করি, উঠতেও পারি না। এই সব তদ্বিরে অধ্যাপক গড়বে মানুষ! একালের সাহিত্যেরও এরা ধারক, কারণ এরা অধ্যাপক, কলির ইন্দ্র, এদের নিয়ে নিটোল গভীর জটিল চরিত্র তো কেউ আঁকছে না, আমি যে স্থির, অথচ চেতনায় তীব্র এই চিত্রইবা কে আঁকছে। আমি তো আমাকেও চিনি না মাঝেমাঝে, কিন্তু যারা লেখে তারা কি হৃদয় জানে? একবার শারদীয়া সংখ্যার কতগুলি গল্প পড়ছিলুম, দেখছিলুম কোনো গল্পের নায়ক স্ত্রীর আঁটকরা শায়ার দড়ি খুলতে প্রাণপণ চেষ্টা করছে, রতিক্রিয়ার পর কাপড় গোছাচ্ছে, কারো স্ত্রী পূর্ব প্রণয়ীর সঙ্গে মিলতে প্রস্তুত, কেউ বিবাহবিচ্ছেদের পর স্ত্রীকে নিয়ে রাত্রে অতৃপ্তির আনন্দ খুঁজছে। এগুলিই বুঝি একালের সাহিত্য, হতে পারে, স্ত্রী যদি পূর্ব প্রণয়ীকে ভালোবাসে, কারো শায়া কেউ যদি খোলে তাতে কার কি, স্ত্রীরই বা কি, স্বামীরই বা কি, অধিকারের আগুন কতখানি, কারো স্ত্রীকে ভোগ করলেও কি না করলেও কি, স্ত্রী যদি পরের সঙ্গে সত্যি কোনো সম্পর্কে যুক্ত থাকে, আমাকে দর্শক ছাড়া আর কিছু ভাবা উচিত নয়। কিন্তু তাই কি সত্য? নির্বিকার আমি!

সুলতাকে আমার জীবনের অনেক কথা বলেছি। কিন্তু কোনো কথা শোনেনি। তবু সে আমার স্ত্রী। কারণ বিয়ের দিন এবাড়ি ওবাড়ি আটশ লোক খাইয়ে বিয়ের স্বত্ব চিরস্থায়ী করে নিয়েছি।

আসলে এ চাকরি আমি নিয়েছি কেন? বাবার অধ্যাপক জীবনের বন্দীদশা আমি সহ্য করতে পারিনি। পঙ্গু পায়ে একা ঘরে

বইয়ের পৃষ্ঠার মধ্যে কি আনন্দ তিনি পেতেন জানি না, কিন্তু আমার ভালো লাগে নি। মানুষের মধ্যে নেশার আনন্দ বেশি গভীর, আকর্ষণীয়। শহরে গ্রামে মাঠে হাটে আমার উপস্থিতিকে ঘোষণা করে জানাবো, এই অঙ্গীকার আমার সারা শরীরে, তাই অধ্যাপক দেখলে বাবার কথা মনে করে ভয়ে শিউরে উঠতুম। আর যা নমুনা দেখছি, ডি. আই. জি. কেউ আত্মীয় থাকলে পড়াবার আর দরকার কি? প্রিন্সিপ্যাল পর্যন্ত তোয়াজ করবে। আসলে আমি মুক্তি চাই, উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে সারা শরীরের প্রাণ তরঙ্গিত করে দিতে চাই, কিন্তু পারি না। কারণ রক্তের গাঢ় মিথ্যে নেশায় অভিজাত অন্ধকারের উন্মাদনা নাচছে, হাসছে। স্থূলতা আমাকে হাতছানি দিচ্ছে!

আমার বাড়িতে একদিন আমার এক সহকর্মী এলো সস্ত্রীক। চাকরিতে জুনিয়র, বছর দু'য়েক হলো সীমান্ত বাংলায় শাসন করছে। সঙ্গে নিয়ে এসেছে এক কবিকে। লম্বা চেহারা, চুলগুলি সব পাকা, বুশ শার্ট পরনে, দাড়ি ও গোঁফ পেকে গেছে, সহকর্মী চ্যাটার্জির সঙ্গে কি করে পরিচয় হলো জানি না। লোকটি বিনয়ে গলে গেল আমার সঙ্গে পরিচিত হয়ে। চ্যাটার্জির চেয়ে ওর স্ত্রীর সঙ্গেই ওর ঘনিষ্ঠতা বেশি। ওদের কোন বাচ্চা হয় নি। চ্যাটার্জির স্ত্রীর বয়েস খুবই কম, নামকরা থিয়েটার অভিনেতার কন্যা, বাবা প্রচুর বড়ো লোক, দক্ষিণ কলকাতায় চার পাঁচখানা বাড়ি আছে। বিবাহসূত্রে চ্যাটার্জি একটি পেয়েছে। চ্যাটার্জির আবার সাহিত্যে বাতিক আছে। কিছু লেখে টেকে। লেখার কি মান জানি না। কেননা এ ব্যাপারে নিজেকে পরিপক্ক করে তুলতে পারি না। কিন্তু এই সব লেখায় কি অর্থ নৈতিক বনিয়াদ গড়ে ওঠে আমি জানি না। উৎপাদনের সঙ্গে কোনো যোগ

আছে কিনা তা আমার চিন্তার বাইরে। তবে এই সব লেখা দেখে মনে হয় লেখার একটা কারখানা এরা সবাই মিলে তৈরি করেছে। কারখানায় যেমন কাঁচামাল দরকার হয়, তেমনি চ্যাটার্জির মতো এই সব লেখকেরা এই কাঁচামাল জোগান দেয়। এই কাঁচামাল থেকে যে বস্তু তৈরি হয়ে বাজারে আসে, তাতে কারখানায় কয়েক হাজার লোকের সংস্থান হয়, তার একটা রঙিন মূল্য আছে খেলনার মতো, খেলনা যেমন প্রথম কয়েক ঘণ্টা ভালো লাগে, তারপর আর ভালো লাগে না, এমনি এদের লেখা, খেলনাকে যেমন নিত্য নতুন হতে হয় চাহিদার জন্যে, এদের লেখাও নিত্যনতুন হয় রঙিন খেলনার মতো। এরা একটা ব্যাবসাকে টিকিয়ে রেখেছে। আমার অর্থনীতির চিন্তায় এর থেকে বেশি আর আমায় মাথার মধ্যে আসে না। কিন্তু এ সব কথা আমি ওকে বলি নি। শত হলেও আমি মাস্টারের ছেলে, বাইরে আমাকে সৌজন্য ও নীতিবোধ কিছু দেখাতেই হয়, ভেতরে যতোই ফুটতে থাকি না কেন।

ওরা সাহিত্য-সভা শেষ করে আমার কাছে এসেছে। চ্যাটার্জির দরকার ছিল, বদলির ব্যাপারে। সাহিত্য করলে কি হবে, এদিকে বৈষয়িক ব্যাপারটা ভালো বোঝে। কাকে বললে কি হবে জানতে চায়।

সারাদিন হৈহৈ করে কাটলো। সুলতা মেয়েটিকে ঠিক আপন মনে গ্রহণ করতে পারে নি। তবু ভদ্রতায় বুঝতে দেয়নি ওর মনের বিরাগ। কবিটি আপন মনে নিজের কবিতা আবৃত্তি করছে। আর হাত জোড় করে বলছে, কেমন লাগছে। আমি মুখ টিপে চুপ করে আছি। চ্যাটার্জি সাধুবাদ দিয়ে 'সাবাশ সাবাশ' বলছে। কিন্তু শব্দ ছাড়া, ধ্বনি ছাড়া ওর অর্থের গভীরতার ঐক্য ঠিক বুঝতে পারলুম না।

বিকেলে ওরা তিনজনে একটু বেড়িয়ে এলো শহরের প্রান্তে। সুলতা আপন মনে রেকর্ডপ্লেয়ার বাজিয়ে রবীন্দ্রসংগীত শুনছিল। রবীন্দ্রসংগীত এখন আভিজাত্যের ও সংস্কৃতির মাপকাঠি।

সন্ধার আলো সরতেই ওরা তিনজনে এলো। রবীন্দ্রসংগীত শুনে

চ্যাটার্জি বিবশ হবার ভান করলো, 'ও আমার দুখ জাগানিয়া।' শেষ হতেই বললো, আলি আকবরের রেকর্ড নেই ? আমি জানি, এটাও আর একরকম এখনকার সংস্কৃতির চালাকি। অর্থাৎ শুধু রবীন্দ্রসংগীত নয় ক্ল্যাসিকালও জানি, এবং সে জানাই প্রকৃত জানা। সুলতার মুখ ম্লান হয়ে গেল। আরো কিছুক্ষণ ওরা রেকর্ড শুনলো। রুচি অনুযায়ী যে যার গায়কদের প্রশংসা করলো ওরা।

তারপর আমার ড্রইংরুমে এলো সদলবলে। চ্যাটার্জির স্ত্রী কখনো ওদের সঙ্গ ছাড়া হয় না। কবিটি কখনো আবেশে উচ্ছ্বাসে উল্লাসে ওর গায়ে পড়ে, কখনো চ্যাটার্জির গায়ে স্ত্রী পড়ে। কবিটি কোনো সাহিত্য পত্রিকার অফিসে কাজ করে, চ্যাটার্জি বললো আমাকে। কবিতার চেয়ে কবিই বড়ো তার ব্যবহারে।

চ্যাটার্জি তার অ্যাটাচি থেকে একটা রামের বোতল বার করলো। ড্রইংরুমে কাঁচের আলমারিতে গ্লাস ছিল, বেয়ারা সাজিয়ে দিয়ে গেল। এখন একটু চাকরি করতে গেলে মদ খেতে হয়। আমি যে না খাই, তা নয়। ভালো লাগে না। বড়ো ক্লান্তি বোধ হয়। ওদের পাল্লায় পড়ে খেলুম দু'পেগ। কবির মদে আসক্তি বেশি। কিন্তু তিন পেগ খাবার পর বেহুঁশ হয়ে মেঝেতে সে গড়াতে লাগলো। মুখে গ্যাঁজলা উঠছে আর আপন মনে বিশেষ লোককে গালাগালি করছে; শালা আমার মতো কবি কে আছে। কবিতা লিখলেই মাইরি কবি। ভেতরের ক্লেদ বাইরে বিনয়ে ঢাকা পড়ে।

চ্যাটার্জি বেহেড হয় না, বেশ খেতে পারে। চ্যাটার্জির স্ত্রী দু পেগ খেয়ে কথা বলতে শুরু করলো আবোল-তাবোল। আমাদের সামনেই চ্যাটার্জিকে ধরে চুমু খেল, তারপর আর এক চুমুক খেয়ে সোফা থেকে উঠে আঁচল লুটিয়ে নাচের ভঙ্গিতে ড্রইংরুমের চারপাশে হেঁটে বেড়িয়ে ইংরেজি গানের কলি ভাঁজতে লাগলো। চ্যাটার্জি তাকে ধরে বসাতে চেষ্টা করলো। পারলো না, চ্যাটার্জিকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিলো। কবি তখনো গড়াচ্ছে, আপন মনে কবিতা আওড়াচ্ছে, কার্পেটের ধুলোয়

মুখ ঘষছে অনবরত। পিউরিটান নই, কিন্তু বাইরে আর্দালি চাকরদের কাছে বিপর্যস্ত না হই, তার জন্যে দরজা ভেজিয়ে দিলুম। একবার সুলতার ঘরে গিয়ে বললুম, তুমি কি আসবে?

সুলতা বই পড়ছিল, মুখ তুললো না প্রথমে, পরে চোখ উঠিয়ে বললো, কেন, বেশ তো ভালোই হচ্ছে।

—তুমি আসতে পারো।

—না, মদের আড্ডায় আমি যেতে পারবো না।

—ওরা অতিথি, গেস্ট।

—গেস্ট মাতাল হলে আমাকেও মাতাল হতে হবে?

—কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না, কতক্ষণে আমি ছাড়া পাবো?

—ছাড়া পাবার দরকার কি!

আমি আর কথা বাড়ালুম না। দরজা ভেজিয়ে ড্রয়িং রুমে চলে এলুম। চ্যাটার্জির স্ত্রী আর নিজেকে সামলে রাখতে পারে নি। সোফায় গড়িয়ে পড়েছে, পাশে চ্যাটার্জি, এর মধ্যে কবি উঠে এসেছে, ওদের সঙ্গে সোফায় জড়াজড়ি করে শুয়ে পড়ে চ্যাটার্জির স্ত্রীর গায়ে মুখ ঘঁষছে। চ্যাটার্জি মাঝে মাঝে চোখ ঘুমে আবার বন্ধ করছে, কবির বিড়বিড় থামে নি। চ্যাটার্জির স্ত্রী অচেতন হয়ে বিস্রস্ত বেশে ঘুমিয়ে পড়েছে ওদের মাঝখানে।

কবিকে আমি জোর করে পাশের একটি ঘরে বিছানায় শুইয়ে দিলুম, পারে মিলে একই স্রোতে পিণ্ডের মতো ভাসছে। মদের বিহ্বলতায় কবিতায় কোনো চেতনা ভেসে ওঠে জানি না। না, নিজের চেতনার মধ্যে যে বিরোধ তাকে ঘুম পাড়িয়ে রাখতে চায়, না মদের কাণ্টের সঙ্গে কবিতাকে মিশিয়ে দিতে চায়; আমি কিছু জানি না। এই বিবশ-করা প্রাণের ঘুমে রাতের অন্ধকারে ওরা ঘুমিয়ে আছে, কাজে ভুলে থাকে। আমিও তো বিস্মৃতি চাই! আমার ঘুম এলো না, ভোরে পায়চারি করতে লাগলুম বাগানে। ওদের ঘুম ভাঙতেই ওরা লজ্জায় পড়লো আমাকে দেখে। কবি তখনো ঘুমোচ্ছে, বাইরে সবুজ

পাতায় ফুলের গন্ধে আলোয় হাওয়ায় পৃথিবীর শিহরন জাগছে। চৈতন্যের সঙ্গে প্রাণও হারিয়েছে ওরা।

একগুণা বেখুদী মুঝে দিনরাত চাহিয়ে

আমার মাঝে মাঝেই মনে হয় এই বিস্মৃতি চাই। এই বেদনার অপর পারে কোন মহাসিন্ধু অতলতা কাজ করছে যেখানে আমি আমি নেই। চেতনায় মানুষ বাঁচতে পারে না, চেতনা ছাড়াও আবার মানুষের কোনো মূল্য নেই। স্থূলতার মধ্যে আমি বাঁচতে চেয়েছিলাম। চেতনার গাঢ় বনে আলোকিত নদীর মতো স্রোতবান হতে চেয়েছিলাম। কিন্তু আমার কাছে, স্থূলতা জড় পদার্থের নির্জীব গাছের মতো প্রাণবান। প্রাণের সাড়া জাগায়, চেতনার কোনো আত্মীয়তা ওর মধ্যে আমি পাই না, অন্তত খুঁজে পাই না আমি। এখানেই বিরোধ বাধে। কিন্তু প্রাণই বোধহয় আমাকে পরাজিত করছে, কারণ এই নির্জীব প্রাণ থেকেই আমাদের জন্ম, এবং স্থূলতার গর্ভে যে সন্তান হবে, সে স্থূলতাকে চাইবে, চেতনায় একাকার হবে।

বনে শিকার করবার জন্যে স্থূলতা অনেকদিন ধরেই বলছিল। যেতে হলো। শিকার করবার জন্যে নয়, বনে কি রূপ আছে, তা দেখবার জন্যে। বনের ধারে সাপের মতো শুকনো নদীর রেখা বালির চরে মাথা গুঁজে শ্বাস নিচ্ছে। নদীর ধারে গাছপালা, সেখান থেকে গাছপালা উঠে এসে বনটাকে ঘন নিবিড় করে তুলেছে যেন। এবং ওপরে অন্ধকার, শুকনো পাতার মর্মর পথের নীচে ককিয়ে উঠছে, বাতাসে ডানার শব্দ, নদীর ঠাণ্ডা হাওয়া কাঁপছে, চারদিকে স্তব্ধতা, গম্ভীর অন্ধকার, প্রশান্ত বাহু তুলে অভ্যর্থনা জানায়। যতদূর এগোচ্ছি, স্থূলতা ততো আনন্দে অধীর হয়ে মিশে যাবার চেষ্টা করছে বনে,

বনের মধ্যে হারিয়ে যেতে চাইচে সে, সবুজ গাছের চিকন পাতার কোলে ওর গায়ের রঙ মিশে যাচ্ছে, তরঙ্গিত প্রকৃতির রূপের মধ্যে সুলতা অপ্রাকৃতিক তরঙ্গ তুলে নাচছে চোখের সামনে, ওকে আমি দেখতে পাচ্ছি না। হারিয়ে যাচ্ছে রহস্য অন্ধকার বনের মধ্যে, ও এগোচ্ছে, আর দুর্বার গতিতে সে আমাকে টানছে, কিছুতেই ওর নাগাল পাই না। ওর দেহে মনে এত রহস্য এমনভাবে তরঙ্গিত হতে পারে, চার দেয়ালের বন্ধ ঘরে কৃত্রিম সাজসজ্জায় কিছুতেই বুঝতে পারি নি, চিনতে পারি নি। কিন্তু, আশ্চর্য, আমি হারিয়ে যাচ্ছি। সুলতা কোনো কথা বলছে না, তবু সে আমাকে টানছে। ওকে থামবার জন্যে ডাকলুম, সাড়া না দিয়ে বনের অভ্যন্তরে গভীর অন্ধকার প্রদেশে শাড়ির আঁচল লুটিয়ে হাঁটছে। দৌড়ে গিয়ে ওকে জড়িয়ে ধরলুম। সুলতা, সুলতা হেসে মুখ ঘুরিয়ে নিলো। ছাড়িয়ে যেতে চাইলো! ওকে জোর করে ধরে বসিয়ে দিলুম। কোনো কথা বললো না, শুকনো কালো হলদে পচা সবুজ লাল বেগনি পাতার ভিড়ে কেমন অবশ লাগলো, গাছের হাওয়ার এমন নিশ্বাস গরম হতে পারে ভাবি নি। সুলতার সারা শরীরটা দুলছে কাঁপছে, তরঙ্গিত হচ্ছে, আমি হারিয়ে যাচ্ছি, আমার সকল গর্ব চেতনা অহংকার গহ্বরের শীতলতায় গরম জলের মত প্রবেশ করছে। সুলতাকে আমি জড়িয়ে ধরলুম বনের ছায়ার অন্ধকারে।

না, পরমুহূর্তেই মনে হলো সমস্ত কিছু মিথ্যে। আলোর জগতে যদি ক্লেদ গ্লানি চুরি হতাশা নর্দমা থাকে, এখানেও আছে, হলুদ পাতার চিৎকার কেন। তবু গভীর বনে আমরা দুজনে একাকী। আমাদের নিশ্বাস একসঙ্গে তরঙ্গিত হচ্ছে, আমাদের স্তব্ধ শরীর পাতার গর্তে সবুজ আনন্দের গানে পাগল হতে চায়। আমরা দুজনে গভীর করে পেলাম। অরণ্যের আদিম গান আমার চেতনায় বধিরতা নিয়ে এলো।

ঠিক এই মুহূর্তেই বন্দুকের একটা বিকট শব্দ ভেসে এলো সামান্য

দূর থেকে। অরণ্য থেমে গেল কেঁপে উঠে, এবং বনের একটা প্রাণী মৃত্যুর ভীষণতায় গর্জে থেমে গেল। স্নুলতা আমার দিকে তাকিয়ে রইল ভয়ে, আমার হাতটা জড়িয়ে ধরে আছে ও! আর সেই মুহূর্তে কোনো মানুষের হাসির শব্দ বনে কাঁপতে কাঁপতে আমাদের দুজনকে আঘাত করলো।

আমারই জয় হলো। চেতনার জগতে এই হত্যা নেই। কিন্তু এই হত্যার মধ্যেই জীবনের গতি লুকিয়ে আছে। নতুন প্রাণ প্রকাশ পায়।

স্নুলতাকে গোপনে ধরে হাসির শব্দ লক্ষ্য করে এগোতে লাগলাম।

এস্. পি. র এত স্যালুট দেখে সন্দেহের বিষ মাথা চাড়িয়ে উঠল। কিন্তু প্রথমত আমার গর্বে অধিকারে স্বাতন্ত্র্যে হস্তক্ষেপ করেছে, আমার চেতনাকে হার মানাতে চাইছে, এ আমি কিছুতেই বরদাস্ত করতে পারি না। আমি বেঁচে আছি, আমার অস্তিত্বের স্বাতন্ত্র্যের জন্যে, দ্বিতীয়ত সুখস্বপ্নকে আমার ভেঙে দিয়েছে, আমার প্রাণের উপলব্ধিকে, নিবিড়তম মুহূর্তে আদি রহস্যের অন্ধকারকে সে হত্যা করেছে, হরিণের হত্যার মধ্য দিয়ে সে আমাকে ও স্নুলতাকে, স্নুলতা ও আমার একাত্ম প্রাণকে একসঙ্গে হত্যা করে মাটির মধ্যে লুকিয়ে ফেলেছে। আমার প্রাণ অথবা স্বর্গ হারিয়ে গেছে কোথায়। এই হারানো স্বর্গ আমি খুঁজে পেতে চাই। কিন্তু চাইলেও সেই অবস্থায় আমি ফিরে যেতে পারি না। চেতনার বন্যা কদাচিৎ ও আকস্মিক ঘটে।

একা ঘরের মধ্যে বসে থাকলেই বনের সেই রহস্য স্নুলতার আলিঙ্গনের মতো কল্পনায় উষ্ণতা নিয়ে আসে। বিচিত্র দৃশ্য জোনাকির আলোর মত জ্বলে নিভে শেষ হয়ে যায়, শুকনো নদীর মরা কান্নায়

প্রাণের তাপ লাগে, বালির ওপর মাটির গন্ধ ছড়িয়ে যেতে চায় উদম বনের অন্ধকারে ঝর্নার গানে আলো ফেলে। ঘন-রাত্রির নিথম অন্ধকারে দস্যুরা যেন মশাল হাতে ডাকাতি করতে বেরিয়েছে। জেলে ও গোয়ালাপাড়া ঘুরে ঘুরে বারবার আমার মনে এই দৃশ্যগুলি ভাসছে। আমি ওদের দলে যোগ দিয়ে যেন এগোচ্ছি, নদীর ধারে বালিয়াড়ির ওপর বৃষোৎ সর্গের মূর্তি খাড়া করে প্রাচীনের গান গাইতে ইচ্ছে হয়। জানি, হরিণের হত্যার পেছনে আরেক বাঘ ওত পেতে আছে, তার কাছে আমাকে স্যালুট করতে হবে, এস্. পি. র মতোই; তবু দেখি কৌতূহলের বন্যার রক্ত কেমনভাবে কতদূর স্রোতে ভাসতে পারে। অন্ধকার কালো জলে চারধারের আঁধারের কালো কাপড়ে রক্ত আগুনের মশাল জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দিতে চাইছে। দেখতে চাইছে, চিন্তা ইচ্ছাকে কর্মে কেমনভাবে প্রয়োগ করতে পারা যায়। আমার খোঁড়া বাবার সত্য, না জীবনের এই বিচিত্র উন্মাদনা সত্য। বাবা গরিব ছিলেন, লেখাপড়া করে ওপরে অনেক উঠেছিলেন, কিন্তু উঠতে পারলেন না, শরীরে পঙ্গু হয়ে গেলেন।

উন্মাদনা থেকে উন্মাদনা জাগে, প্রাণের সাড়া প্রাণে লাগে, একই প্রকৃতি থেকে বিচিত্র মানুষ বিভিন্ন উন্মাদনায় কাঁদে, আর প্রাণে বিবশ হয়ে যায়। প্রকৃতি কারো একান্ত নিজস্ব সম্পদ নয়, যেখানে একান্ত নিজস্ব সম্পদ সেখানে বুদ্ধি আইন সেই সঙ্গে ব্যক্তির লোভ জড়িয়ে আছে। যে বনে সুলতাকে নিয়ে আমি আদিম রহস্য অনুভব করেছি, আমার চেতনাকে জলাঞ্জলি দিয়ে ওর সঙ্গে একাত্ম হয়েছি, সেখানে আবো আদিমতার আনন্দ আস্বাদন করতে পারে। সুলতাও আদিম প্রকৃতি, তাকেও....নানা। আমার অধিকার বোধ আমাকে চেতিয়ে তুলছে, কিন্তু তাতে প্রাণের কি! কিন্তু প্রাণ ছাড়া চেতনার কোনো অস্তিত্ব নেই। প্রাণের গর্ভ থেকেই চেতনার ক্লেদাক্ত জন্ম, ক্লেদগন্ধে আমি যেন নিমজ্জিত চেতনার আলো।

চেতনা চেতনা করি, আসলে চেতনা কী জানি না।

না, সুলতাকে আমি চেতনায় আলোকিত করতে চাই, চেতনায়

আলোকিত হলেই আমার বিশিষ্ট সত্তার সে ভাস্বর হয়ে ওঠে, চেতনার পবিত্রতা প্রাণের বিশুদ্ধিকে সম্ভব করে তুলবে। অনালিঙ্গিত পুরুষের নিঃসঙ্গ যন্ত্রণা ও বেদনার অতলান্ত গভীরতা মাটির অণুপরমাণুর সক্রিয়তার মৌহূর্তিক গতি লাভ করুক। আমি স্থুলতাকে একান্ত একান্ত করে চাই, আমার চেতনার দীপ্ত শরীর ওর দেহে চিত্রিত হোক!

বিদায়ের বিদায় বলে একটা অনুভব মনের মধ্যে বাজে, বন থেকে হারিয়ে আমি সেই বিদায়ের মধ্যে গিয়ে পৌঁছেচি। আমি বিদায়কে হারিয়ে কোথায় আমি যেন, আমার সব পাওয়ার মধ্যে সব হারাবার কান্না লুকিয়ে থাকে, আসলে আমি কিছু পাই নি, পাবার অধিকার জন্মে নি কখনো। না, বাইরে কর্কশ বাতাসের চিৎকার ভাসছে। আমি বিশুদ্ধ অন্ধকার চেয়েছিলাম বনের মধ্যে, অন্ধকার কালো হয়ে গেল, সবুজ বনানী গাছের পাতায় পচা কালো জলে রূপান্তরিত হয়ে গেল হঠাৎ। আকাশের নীলের আভা ব্যাঙের ডাকের অন্ধকারে ঢুকে গেল যেন, তবু কোন উধাও হরিণীর উদ্‌ভ্রান্ত নীরবতা আমাকে পেয়ে বসে।

রাত্রির বিশুদ্ধি অন্ধকারে ছায়ার ছায়ার আলো হয়ে জ্বলে। বাইরে বিষাক্ত গ্রীষ্ম আমাকে পুড়িয়ে মারছে। উচ্ছৃংখল উদ্‌ভ্রান্তি, কোথাও শান্তি নেই, অস্থির চঞ্চলতা উড়ছে বাতাসে।

কোথাও মেঘ নেই, আকাশে নীলও নেই, কী রকম ঘোলাটে লাল হয়ে আছে। ঝড় উঠ্‌বে হয়তো প্রচণ্ড ধুলো উড়িয়ে।

ঝড় উঠলো, ধুলো ছড়িয়ে গেল চারদিকে, কিন্তু কোথাও বৃষ্টি নেই, ধুলো রি-রি করতে লাগলো, কির-কির করতে শুরু করলো দাঁত।

কি সব আবোল-তাবোল ভাবছি, লিখছি। এ লেখার মানে

নেই, নেহাৎই অভ্যেস, বেঁচে থাকবার অভ্যাসের মত একঘেয়ে, নিশ্বাসপ্রশ্বাসের মতো একঘেয়ে। তবু ছোটবেলা থেকে আয়ত্ত করেছিলুম নোট নেবার, এটা তারই ফল।

আর্দালি এসে জানালো একটি লোক দেখা করতে চায়। এতো রাত্রে এখানে আবার কে এলো! আমি তো বলেই দিয়েছি, আমাকে যেন বাড়িতে জ্বালাতন না করে। না, এরা আমার কোনো কথা শোনে না! কে এক সলিল ব্যানার্জি? রিপোর্টার! কি জানি, কোথায় কি বিপদ করেছি, তারই সংবাদ নিতে এসেছে আমার কাছে। অগত্যা আসতে বললুম। একটি অত্যন্ত রোগা চেহারার লোক, একটু কুঁজো, চোখে হাইপাওয়ারের চশমা, দুই গালে গর্ত, সারা মুখটা চোকো, বেঁটে-খাটো, পরনে বুশ সার্ট ও ট্রাউজার। হাসি লেগেই আছে মুখে, হাসলে সুন্দর ফরসা দাঁত বেরিয়ে পড়ে। অভিযোগের ভঙ্গিতে বললো; কি চিনতে পারলে না, আমি সলিল, একসঙ্গে পড়তুম।

মনে মনে রাগ হলো, যেন সকলকেই আমার চিনে রাখতে হবে, আর আমার চাকরির মোহই এই, আমার কাছে অনেকেই উমেদারির জন্যে আসে। গম্ভীর হয়ে চুপ করে রইলুম। আর 'তুমি' বলে, কী সাহস!

সলিলের কথায় সিলেটি টান। বললো, মনে হচ্ছে, চিনতে পারো নি। কিন্তু ভাই চিনতে না পারলেও আজ তোমার এখানেই আমার রাত্রি কাটাতে হবে। একটা দরকারে এসেছিলাম।

মুশকিলে পড়া গেল, চিনতেও পারছি না, আবার মুখের ওপর কোনো কথাও বলতে পারছি না এখন। এটা আমার দুর্বলতা। ভাবতে শুরু করলাম, সত্যি কি লোকটি আমার চেনা! কিন্তু লোকটা কে? কিছুতেই মনে করতে পারলুম না।

লোকটি আমার সামনে বসে আপন মনে পত্রিকার পৃষ্ঠা উল্টে বিচিত্র রঙের ছবি দেখছে। হাসছে একটু একটু। আমি কথা বলতে চাই না।

পাশে আমার বিছানাটা পড়ে আছে, চাদর নেই, আমার টেবিলের ওপর গ্লাস ঢাকা আছে। তাতে কোনো জল নেই, মাঝে মাঝে স্টিলের আলমারির চাবি হারিয়ে যায়। আমি কিছুতেই আমার চোখের সামনে-বসা সলিল ব্যানার্জিকে চিনতে পারছি না, হয়তো শেষ পর্যন্ত আমি চিনতে পারবো না নিজেকে।

সলিল মুখ তুলে তাকালো, বললো ; আপনার সঙ্গে পড়তাম ভুলে গেছেন।

কি জানি, মনে হলো একটু চিনতে পারছি। উদাসীনভাবে বললুম, সে অনেকদিনের কথা। তা বেশ তো থাকুন। কিছু দরকায় আছে? হাত তুলে সাড়া অঙ্গটা নাড়িয়ে বসলো সলিল, না, এখানে এসেছিলাম, তাই দেখা করতে এলাম। শুনলাম, ফরেস্ট ডিপারমেণ্টের আইন অমান্য করে একটি লোক এখানে হরিণ মেরেছে। আমাকে এ ব্যাপারে একটু খোঁজ নিতে বলেছিল আপিশ থেকে।

আমি অবাক হয়ে গেলুম, এর মধ্যে সংবাদপত্রের লোকেরা কিভাবে জেনে ফেলেছে, আমি কোনো কথা বললুম না। চাকরকে ডেকে চা আনতে বললুম ; জিজ্ঞেস করলুম ; রাত্রে থাকবেন তো !

—ইচ্ছে ছিল। তবে যাবো। রাত্রি এগারটার গাড়িটা ধরবো।

চা খেয়ে চাকরকে বললুম, আজ একজন গেস্ট আছে।

এমনিভাবে আরও কিছুক্ষণ সময় চলে গেল, কিছুতেই মনে করতে পারছি না। মনে করতে পারছি না, কথা কইতে পারি না। এমনিই আমার কথা বেরয় না, সব কথা কেমন গলায় এসে আটকে যায়, মাথায় ছড়িয়ে পড়ে, উত্তপ্ত মস্তিষ্কে কথাগুলি সেলের মধ্যে ঘুরপাক খেতে থাকে।

এর মধ্যে একটু বেরুতে হলো আমাকে। ফিরে এসে দু'জনে একসঙ্গে খেলুম, খেতে খেতে সলিল আমাদের এক কমন ফ্রেণ্ডের কথা বললো ; তার কথা মনে হতেই বিদ্যুৎচমকের মতো মনে হলো যেন ওকে আমি চিনতে পেরেছি। হ্যাঁ, চিরকালই ও লাজুক।

লাস্ট বেঞ্চে বসতো। আপন মনে উদাস হয়ে বাইরে তাকিয়ে থাকতো ও। আমি তখন নোট নিতে ব্যস্ত, কারো সঙ্গে কথা কইতুম না, অধ্যাপকেরা আমাকে নিয়ে বিব্রত, সব প্রশ্ন আমাকেই বলতো এবং যা প্রশ্ন করতো তার বেশি উত্তর ওরা পেতো, হয়তো ভয়ে শেষ পর্যন্ত আর কোনো কথা আমাকে জিজ্ঞেস করতো না। সলিল বা অন্য কেউ আমার কাছে ঘেঁষতো না, অথবা কেউ আমার জগতে, আমার মনের মধ্যে ঢুকতে পেতো না। আমার মনের মধ্যে বিশাল রাজ্য তৈরি করে সেখানে দাপিয়ে বেড়িয়েছি, এখন আমি রাজ্য পেয়েছি বাইরে, কিন্তু তাকে অধিকার করতে পাচ্ছি না, ভেতরের বিশাল রাজ্যকে বাইরের রাজ্যে মিশিয়ে দিতে পারি নি বলে নিজেকে কেমন সঙ্কুচিত মনে হচ্ছে, এখন আর মনের মধ্যে জগৎ তৈরি করতে পারি না এবং বাইরেও মিশতে অক্ষম, এই অন্ধকার শূন্যতা আমাকে চেপে মারতে আসছে। না, এখান থেকে আমাকে বেরুতেই হবে। আমি অন্ধ নই, চোখ মেলে দেখতে চাই, কিন্তু আমার ভেতরে এক অন্ধ লুকিয়ে আছে, সে কিছুই দেখে না, স্পর্শ ও শব্দ সুখে বিভোর হতে গিয়ে নিঃসাড় হয়ে যাচ্ছে, তাই বাইরে আমি লাফাচ্ছি। ভেতরের অন্ধ লোকটাকে আমি বাইরে এনে সূর্যের আলোয় দাঁড় করাতে চাই, কিন্তু সূর্যের আলো তাকে অন্ধ করে দিচ্ছে।

সলিল এতো লাজুক, কি করে রিপোর্টারের কাজ করে জানি না। না কি এটা একটা মুখোশ, এই মুখোশের আড়ালে নিজেকে বড়ো করবার প্রেরণা লুকিয়ে আছে। জানি না, দেখে তা মনে হয় না। তবে লোক বোঝা ভার।

কথায় কথায় আপনি থেকে তুমি হয়ে গেছি! বললুম; হ্যাঁ, যে লোক হরিণ হত্যা করেছে তাকে আমি মারবো। তার অন্যায়ের জন্যে তাকে শাস্তি পেতে হবে।

হায়রে, এ কার হরিণ কে হত্যা করেছে! আমার হরিণই হত্যা করেছে সে। সলিল সাধারণ খবুরে কাগজে লোকের মতো চটপটে

নয়, কথা বললেই সব কথা ধরতে পারে বলে আমার বোধ হয় না, এবং তৈরি করার ক্ষমতা থাকলেও কাজে লাগাতে পারে না, তবে বোঝে, হিশেব করে কথা বলে, প্রতিটি বস্তুর সম্পর্ক জানতে চেষ্টা করে, সাংবাদিকতায় যে ওভারস্মার্টনেস দরকার তা ওর নেই; সংবাদপত্রের লোকেরা বইয়ের মলাটের পরিচয় পড়ে সব জানে, পৃথিবীর তাবং জ্ঞান ওদের মাথায়, ওরা ডি. এন্. এ-আর. এন্. এ থেকে নিউট্রাল মনিজম পর্যন্ত জানে। ওরা ইতিহাস না পড়েও পৃথিবীর ইতিহাস ওগড়ায়, আমি অর্থনীতির ডাকসাইটে ছাত্র ছিলুম, আমাকেও এক ব্যাঙ্গলা-পড়া সাংবাদিক অর্থনীতি বুঝিয়ে গেল বেঁকা ঠোঁটে হাত-পা নেড়ে। ওরাই পৃথিবী চালাচ্ছে, প্রধান মন্ত্রীর সঙ্গে যদি কেউ পাল্লা দিতে পারে, তাহলে তা পারে সংবাদপত্রের লোকেরা, তন্দ্রাজড়িত নেশার রাত্রে যে সংবাদ ছাপা হয়, সেই সংবাদই মানুষকে ভিখিরি বা রাজা করতে পারে। পৃথিবী এখন ওদের তাঁবে। যশ খ্যাতি প্রতিপত্তি ওদের হাতে, আমাকেও ভয়ে ভয়ে থাকতে হয়, ওরা হয়কে নয় করতে পারে, নয়কে হয় করতে পারে, কোটি কোটি ছাপার অক্ষরে পৃথিবীর মত উল্টে দিতে পারে। তাই ওদের সামনে আমি কোনো কথা বলতে চাই না; না চাইলেও বিপদ, অসামাজিক বলে গালাগাল দেয়; ওদের সন্তুষ্ট না করলে মিথ্যে অজুহাতে খারাপ রিপোর্ট ছাপিয়ে দেয়। এখানে আমাকে ডিপ্লোম্যাট সাজতেই হয়। সুতরাং সলিল সম্বন্ধে আমার ভয় আছে, বললুম; দু পেগ হবে না কি?

হেসে কাত হয়ে পড়লো, বললো; না আমি খাই না।

আরেক অবাকের ধাক্কা! সংবাদপত্রে কাজ করে, অথচ মদ খায় না! এ সোনার পাথরের বাটি। সংবাদপত্রে কাজ নিয়েছে তো অনেক মদ খাবে বলে। আমাকে এক নিউজ এডিটর এ তথ্য বলেছিল। বললুম; আমাকে অবাক করলে। তুমি মিথ্যে বলছ না তো যে তুমি সংবাদপত্রে চাকরি করো?!

সলিল হেসে বললো; তা বলতে পারো, হয়তো না।

জোর দিয়ে বললুম , সলিল, সত্যি কি তুমি হরিণের হত্যার ব্যাপারে এসেছো খবর নিতে ? না অন্য কিছু ?

—তোমার কাছে আমার খবর নেওয়াটা গৌণ। আসলে আমার জীবনের ভেঙে-পড়ার একটা কাহিনী আছে । আমি যাকে ভালবাসতাম, তার বিয়ে হয়েছে এখানে। পরশু লণ্ডন চলে যাবে। তাই দেখা করতে এসেছিলাম।

—দেখা হলো ?

—না, যেতে পারলাম না আমার জন্যে ওর কষ্ট হোক, ওর স্বামী ওকে সন্দেহ করুক, এ আমি চাই না।

—মেয়েটি তোমায় ভালোবাসে।

—জানি না। আমি ভালোবাসি এই পর্যন্ত। বিয়ের আগে চিনতো, সে আমাকে ভালোবাসতো।

—তাহলে তোমার আসবার দরকার কি। নিজের মনের ঘরে থাকলেই তো হতো।

—আমি তো তাই নিয়েই আছি। তবু এই চোখটা, আমাকে অন্ধ করে দেয়। চোখটাকে আমি অন্ধ করে দিতে পারছি না প্রত্যুম্ন। আমি অন্ধ হয়ে তাকে দেখতে চাই।

—এই চোখের চাওয়াতেই তো জগতের চাওয়া, তাকে তুমি হারাতে চাইচ।

—পারি না, কারণ শরীর তো ছেড়ে কথা কয় না। ও প্রকৃতি। প্রস্ কোয়টার্সে যাই, টাকা দিই, না, ঘৃণা হয়, ওরা রাগে, ওদের আমি রেগে গিয়ে বলি, তোমরা টাকা চাও, এই নাও। রাগবার কি আছে। আমরা সংবাদপত্রে কাজ করি বলেই আমাদের ভয় ডর কোনো কিছু নেই। আমার গাট্‌স আছে। তাই যাই। কারো বাবার টাকায় তো আমি যাই না। আমি যে না শুয়েছি তা নয়, কিন্তু তারপর বড়ো ক্লান্তি ও ঘৃণা। মেয়েটি আমাকে ভালোবাসে জানো প্রত্যুম্ন। ও নাকি ওর স্বামীকে বলেছে। বলেছে, আমরা বন্ধু হয়ে থাকবো।

আমি ওকে ভালোবাসি। কিন্তু এই ভালোবাসার স্বপ্ন আর দেহের কাদা....

—তুমি ওকে বিয়ে করলে না কেন।

—বিয়ে হলো না, ও-ই চাইলো না। বিয়ের ব্যাপারে মেয়েরা সম্মান খ্যাতি প্রতিপত্তি চায়, আমার তা নেই।

আমি তলায় তলায় আতঙ্কে চমকে উঠলুম! সলিল কি বলছে আমার সামনে।

সলিল বললো ; মাঝে মাঝে মাঝে কষ্ট হয়, কিন্তু আনন্দও হয়।

—বাড়িতে বিয়েয় জন্যে পেড়াপীড়ি করে না ?

—বাঙালি সমাজে এটা কি না হয়ে পারে! না আমি টাকা উপার্জন করি। আমাকে চটাতে পারে না। প্রত্যুম্ন, ভালোই আছি। প্রেস্‌কোয়ার্টার্সে গিয়ে আমি মালতীকে খুঁজি না, ও আমার বুকের ভিতরে আলো জ্বেলে আছে। ভেতরে কুসুমস্পর্শে ছেয়ে আছে, তাকে আমি বাইরে দেখতে চাই না। বরং বাইরে কুৎসিত জায়গায় গিয়ে তাকে আমি আটকে রাখতে চাই।

—তাহলে পালিয়ে এলে কেন ?

—এই ভীরু ভয়ই তো আমাকে পাগল করে ?

পরের দিন সলিল চলে গেল। বড় বিষণ্ণ, নিঃসঙ্গ, একাকী। আমার জিপই ওকে পৌঁছে দিয়ে এলো স্টেশনে।

ওর দেহ ও মন আলাদা, মনের স্বপ্নে দেহ যে নরক জাগায়, তাতে ওর ভ্রূক্ষেপ নেই। না, আমি যাকে চাই তাকে পূর্ণ করে চাই, আমার দেহ ও মনে এমন কোন বিভেদ সইতে পারি না। আমি সমগ্র সত্তা দিয়ে পেতে চাই। আমার শরীরের অনুভবে স্বপ্ন জলের মতো স্নান করাক।

সলিলটা এসে আমাকে নাড়িয়ে দিয়ে গেল। ভালোই হলো, সংবাদপত্রের একটা লোক তবু আমার সহপাঠী ? তবে নিশ্চিত হবার কারণ নেই, সংবাদপত্রে কি বেরুবে, তা কেউ আগে বলতে পারে না।

লোকটা হরিণকে হত্যা করে নি, আমার মনের ভেতর।ঘুমন্ত হরিণের স্বপ্নকে সে হত্যা করেছে। স্থূলতাকে মেরেছে।

স্থূলতার আত্মকথা

প্রদ্যুম্ন ডায়েরিতে সেসব কথা লিখতে পারে ভাবতেই অবাক লাগছে। অথচ ওর ডায়েরি যে ওর কাছে নেই, সে খেয়াল নেই। ও সৃষ্টি করতে চায়, সৃষ্টিকে ভেঙে চুরমার করতে চায়। ওর ঐশ্বর্য আছে, বীর্য আছে। কিন্তু সেই পরম জ্ঞান নেই, যাতে আপনার মধ্যে সমস্ত কিছু ধারণ করতে পারে। ও আমাকে নিয়ে মাটির ঢেলা বানাতে চায়, পর মুহূর্তেই ভাঙতে চায়। এই কারণেই ওর সঙ্গে আমার বিবাদ। আমি ওর কাছ থেকে আলাদা হয়ে গেছি। অথচ এই আলাদা ও থাকতে দিতে চায় না, কিন্তু আলাদা থেকে কোনো উপায় নেই। কারণ আমি ওর মধ্যে আত্মলীন হতে পারি না। আমি কি চেষ্টা করেছি? আমি না করি, কিন্তু প্রদ্যুম্ন করে না কেন? প্রদ্যুম্ন আমাকে ভালোবাসে না, ওর ঐশ্বর্যে বীর্যে আমাকে আত্মসাৎ করতে চায়। তাই আমার নিজের জন্যেই ওর কাছে আমি আলাদা।

বাসুদেব এসেছিল। প্রদ্যুম্ন বাসুদেবকে সহ্য করতে পারে না। ওকে নিয়ে ওর সন্দেহের বিষ গোপন ঘরে কালনাগিনীর ফণা তোলে। কিন্তু বাসুদেব এলেই আমার অহংকার, গর্ব, স্বাতন্ত্র্য ব্যক্তিত্ব কেমন শিশিরের মতো সকালের কচি সবুজ পাতায় টলমল করতে থাকে। আমাকে আর আমার কাছে মনে হয় না। শুকনো নদীর বালির চরে এঁকেবেঁকে বেড়াতে পরম আনন্দ। মনে হয়, বাসুদেব আমার চেতনাকে অবশ করে দিতে পারে। মনে হয়, নিশ্ছিদ্র পাখির বাসার মধ্যে দুটি পাখি বাহ্য জগৎ থেকে বিছিন্ন হয়ে পরস্পর বসে নিজের হয়ে যাচ্ছি। আমার কোনো শক্তি থাকে না, যে শক্তিতে আমার সঙ্গে প্রদ্যুম্নের

অগ্নিস্রাবী বিবাদ শুরু হয়, তার চিহ্ন মাত্র নেই। সেই বনের ভেতর আদিম অরণ্যে মিশে যাবার বেদনাগন্ধ আলোকিত হতে থাকে। আমার এই আত্মসমর্পণের বেদনা পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে।

বাসুদেবের সব আছে, প্রেমে সে আমাকে আকর্ষণ করে, তার কথাবার্তায় আমার মধুর গোলাপ লজ্জায় আরক্ত হয়, তথাপি মনে হয়, বাসুদেবের সঙ্গে আমার কোথায় একটা ব্যবধান লেগে আছে। বাসুদেব আমাকে আকর্ষণ করলেও, বাসুদেবকে আমি আকর্ষণ করতে পারি না। ওর মনের মধ্যেই আমি, অথচ আমাকে ও টেনে নিতে পারে না। কিন্তু ওর মধ্যে জ্ঞানবুদ্ধি, বাড়ির ঐশ্বর্য, শরীরের বীর্য শক্তি, পৌরুষের তেজ সব আছে। প্রত্যুম্ন তার কর্মের ঐশ্বর্য, এবং শরীরের গোঁয়ার বীর্য দিয়ে আমাকে ভোলাতে চায়। এ ছাড়া অন্য শক্তিগুলি ওর মধ্যে সুপ্ত হয়ে আছে। সুপ্ত হয়ে আছে, না, বাসুদেবের মধ্যে আমার প্রাণপুরুষ কাঁদে বলেই দেখতে পাই না, ঠিক করে বলতে পারি না। কিন্তু সৃষ্টির ঊষালগ্নে বাসুদেবের অনন্ত বুকের মধ্যেই আমার অধিষ্ঠান। ওখানে আমি অনন্তকাল নীরবে গোপনগন্ধে স্বপ্নে জাগরণে নিদ্রায় অতিবাহিত করতে পারি। এত জোরে বাসুদেবকে আমি আকর্ষণ করি, তথাপি বাসুদেব আমার আহ্বানে সাড়া দেয় না। অথচ আমার প্রতি যে আসক্তি রয়েছে, এ কথা তো ওর এই হঠাৎ আসাতেই প্রমাণ করে। কিন্তু একে ও জোরে নিবিড় করে পেতে চায় না কেন, আমাকে আমি সর্বস্ব দিয়ে পাই না কেন ? ওর সঙ্গে আমার বহুকালের সম্পর্ক। যৌবনে ছেলেখেলার মধ্য দিয়ে ও আমাকে আকর্ষণ করেছে, আমি ওর বুকের মধ্যে বাসা বেঁধেছি। হয়তো, হয়তো কেন, আমার জন্যেই ও বিয়ে করেনি। বিয়ে যদি করেনি, এবং আমাকে যদি সত্যি ভালোবাসে, তাহলে, না, হয়তো নীতিবোধ সমাজবোধ ওর মধ্যে কাজ করছে। আসলে এই আবরণ থেকেই যায়। বাইরে শুধু তর্কের জন্যে বিশুদ্ধ হৃদয়ের অস্তিত্ব, এই অস্তিত্ব বাস্তবে শূন্য। কিন্তু আমি কি অন্যায় করছি, স্বামীকে বঞ্চনা করছি। প্রত্যুম্ন স্বামী হয়ে আমার হৃদয়ে এল কেন ?

কে ওকে স্বামী হতে বলেছিল? আমার পড়াশোনা, বাসুদেবের স্বপ্নে বেশ তো ছিলাম। যাকে চিনি না, জানিনা, দেহের বিনিময়ে তাকেই সত্য বলে স্বীকার করে নিতে হবে! এই দেহটাই কি সব? দেহের শান্ত জলে আকাঙ্ক্ষার কামনার ঝড় সব সময় বয়ে যায়। আমার তরফ থেকেও কি ত্রুটি থেকে যায় নি? যদি আমি বাসুদেবকেই সত্যি ভালোবেসে থাকি, ওই যদি আমার হৃদয়ে একমাত্র আসল অধিকার করে থাকে, তাহলে বাবার জোরের কাছে নতি স্বীকার করলুম কেন, মা'কে জানিয়ে দিতে পারলুম না কেন, বাসুদেবকেই আমার চাই, ওকে না হলে আমার জীবনের মূল্য কিছু নয়। দুর্বলতার রন্ধ্রপথে প্রদ্যুম্ন ঢুকেছে, প্রদ্যুম্ন তার সমস্ত মূল্য ছিনিয়ে নিতে চায়। প্রদ্যুম্ন তার নিজের মতো ভালোবাসতে চায়। এ ভালোবাসা আমি বুঝি না, হয়তো বুঝতে চাই না, তাই সহানুভূতি নেই। কিন্তু নারী হিশেবে আমাকেই প্রদ্যুম্ন প্রথম স্পর্শ করেছে। তাই ওর সমগ্র স্পর্শের মধ্যে আলিঙ্গনের মধ্যে তপ্ত বৈশাখের মধ্যাহ্ন জ্বলতে থাকে। আমাকে গলিয়ে দিতে চায়। কিন্তু আমি নগ্ন হাড়ের মতো শাদা দেহে ওর সামনে বিদ্রূপের ভঙ্গিতে দাড়িয়ে থাকি। ওর রাগ ওর ক্রোধ ওর হিংসা আরো উত্তপ্ত হয়, সবই নিতে চায়, কিন্তু আমার মধ্যে যে কোথায় বাধা আছে ওর পৌরুষ দিয়ে ও বুঝতে পেরেছে, বুঝতে পেরেছে বলেই ওর রাগ বাড়তে থাকে। আমাকে ছিঁড়ে টুকরো করে মারতে চায়। ওর এই উন্মত্ততা আমাকে প্রথমে রাগাতো। এখন শুধু হাসায়। এই হাসি ওর পক্ষে আরো মারাত্মক। জিনিসপত্র ভেঙে চুরমার করতে চায়, আমার অস্পষ্ট সুরের গান শুনে দাপাদাপি করে। নেহাৎ শাসক, তাই ভদ্রোচিত ব্যবহার করে, তা না হলে চিৎকার ক'রে, নতুবা পিস্তলের গুলিতে আমাকে হত্যা করতে পারতো। মাঝে মাঝে দুঃখ হয়, কেন আমি ওর জন্যে সমস্ত কিছু গলিয়ে শেষ করে দিতে পারি না। আমার অক্ষমতার অপরাধ আমাকে মাঝে মাঝে পীড়া দেয়। ওর নিষ্পাপ রাগ ক্রোধের মধ্যে ওর ওই নির্মল ভালোবাসা ওকে চেতিয়ে পাগল করে আরো। এ

সবই বুঝি, তবু যেন কোথায় বাধা। প্রত্যুম্ন ও আমার মধ্যে বিস্তর বাধা, আমি আমার আপন জগৎ নিয়ে আছি। বাসুদেব যে আমার মনে সমস্ত ক্ষণ অধিকার করে আছে বা থাকে তা নয়, যদি করে থাকে তা হলে মানুষের চেতনার সত্তা নেই। তবু প্রত্যুম্ন ও আমি আলাদা। মাঝে মাঝে একটা খেয়াল আমার মনের মধ্যে কাজ করে, ভাবি, প্রত্যুম্ন ভালোবাসতে চাইচে, প্রত্যুম্ন ভালোবাসতে চাইচে প্রত্যুম্নের জন্যেই, আমার জন্যেই কি প্রত্যুম্ন ভালোবাসে? আমাকে ঘিরে যদি ওর ভালোবাসা চরিতার্থ হয়, তাহলে ওরই চরিতার্থতা। যেমন বাসুদেবকে ঘিরে আমার ভালোবাসা। বাসুদেব আমাকে চাইলেই পায়, এবং মনে মনে চায়ও, কিন্তু তবু আসে না। প্রত্যুম্ন চেয়েও আমাকে পায় না। কিন্তু দুই পুরুষের মধ্যবর্তী সুলতা কি পাপী, অপরাধী? প্রত্যুম্ন যদি আমকে ভালোবেসে সার্থক হতে চায়, বাধাটা কোথায়, আমার পাপ কোথায়? শুকনো বালুর চরে মরা নদীর তীরে বসে বাসুদেবের পাশে প্রত্যুম্নের মুখটাই কাঁপছিল। নদীর ওপারে সেই অরণ্যপ্রান্তের নিবিড় অন্ধকারে প্রত্যুম্নের পৌরুষ গান গাইছিল। বাসুদেব স্বভাবত কথা কম কয়, আমার এ চিন্তায় ব্যাঘাত ঘটাচ্ছিল না। আমাকে ছাড়িয়ে যাবার চেষ্টাও ওর নেই। কিন্তু আমি আছি, আমার উপস্থিতির মধ্যেই ওর উপস্থিতি জড়িয়ে আছে, এমন একটা গন্ধ-মাখানো সুরে ওর চোখমুখ নিশ্বাস স্তব্ধ ও আন্দোলিত। মাঝে মাঝে মনে হয়, ওকে যেন চেতিয়ে দিই, ওকে ভেঙে ফেলি, আমার তপ্ত হৃদয়ের কটাহে ওকে গলিয়ে দিই, আমার নারীত্বের সমস্ত মোহনীয় আকর্ষণ মেলে দিয়ে আমার কাছে নিয়ে আসি, আমার দাস বানিয়ে দিই। তখুনি মনে হয়, এই পুতুলকে নিয়ে কি করবো। পাবার আগে প্রত্যেক পুরুষই দাস হয়ে যায়, কিন্তু ছোঁবার পরে রাত্রির তাপে শেষ লগ্ন উপস্থিত হলে দাস প্রভু হয়ে ওঠে। তখন আমরা পুরুষকে চাই না, মনে হয় আরেকজনকে দাস বানালে ভালো হতো; হয়তো সেই আশায় অন্য আরো অনেকের সঙ্গে বন্ধুত্ব করি। কিন্তু এই বন্ধুত্বের শেষ সীমা কোথায়, পরম্পরায় কত দাস বানাবো, দাস

বানাবার আমার শক্তি কতটুকু, কতটুকু দিয়ে কতজনকে আমি ভোলাতে পারব, দ্রৌপদীর অস্তিত্ব তো আজকে নেই। তাই মনের মধ্যে একটা সীমারেখা টেনে একজনের মধ্যেই দাস ও প্রভুর খেলায় সন্তুষ্ট থাকতে হয়। প্রত্যুম্ন অত্যাচার করে, আমার মনের মধ্যে সে আমাকে পায় না বলেই অত্যাচার করে, এবং অন্য নারীর প্রতি তার আসক্তি নেই বলেই আমার ওপর ওর এতো জোর, তবু প্রত্যুম্নকে আমি নিতে পারি না। প্রত্যুম্ন থেকে আমি অনেক দূরে। বিচ্ছিন্ন, ব্যবহিত, অসংলগ্ন। প্রত্যুম্নের এই ভাঙাচোরা মাঝে মাঝে, মাঝে মাঝে নয়, অনেক সময়ই ভালো লাগে, আমাকে ঘিরেই ওর মাকড়শার জাল বুনছে, আমাকে ঘিরেই শ্রান্ত ঘোড়ার মত মুখে গ্যাঁজলা তুলে নাক ফুলিয়ে কাঁপছে, চোখে মুখে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বার হচ্ছে, ওর চেতনার বীর্য আকাশে-বাতাসে ভাসছে। কিন্তু কোথায় যেন আমার নিস্তেজতা রয়েছে, আমার মনের গোপন অন্ধ গুহায় যে ফুল শিশির জড়িয়ে চোখ বুজে ঘুমিয়ে আছে, তাকেও নাড়াতে পারে না, পারে না নয়, সেখানে ওকে ঢুকতে দিই না, দিতে পারি না, দিতে চাই না। এ অপরাধ আমার, কিন্তু এ অপরাধ তৈরি করেছি আমার রক্ত দিয়ে, আমার বুদ্ধি মন চেতনার আলো দিয়ে। আসলে এ যদি অপরাধ হয়, তা হলে গোটা সুলতা সত্তাই এই অপরাধ তৈরি করেছে। আমাকে না ভেঙে এই অপরাধ কেউ দূর করতে পারবে না।

কিন্তু আমার জ্বালা হচ্ছে বাসুদেবকে আমি পাই না। বাসুদেবের জন্যে আমার সমগ্র সত্তা উন্মুখ হয়ে আছে, তথাপি বাসুদেব আমাকে চায় না। ওর মনের মধ্যে আমাকে বসিয়ে ও সন্তুষ্ট থাকতে চায়, এবং এমনিভাবেই আছে। কিন্তু যদি এমন হতো, বাসুদেব আমার শরীর মন প্রাণ সব নিচ্ছে, জোর করে আঁধার রাত্রে আমাকে জাগিয়ে দিয়ে গোপন ফুলের সুরভিতে আমাকে মাতাচ্ছে, আমার শরীর টেনে নিয়ে উন্মথিত করে আমাকে তৃপ্ত করছে, তাহলেও কি আমি সুখী হতে পারতুম? আমার সত্তা, আমার সম্মান বাধা দিত। স্বীকার করি আমার ব্যক্তি-স্বাধানতা

রয়েছে, আমার স্বাধীন মন আছে, আমার স্বতন্ত্র সত্তা রয়েছে, আমার স্বাধীনতা অনুযায়ী এই দেহশরীর একজনকে দিতে পারি। কিন্তু একে দিতে পারলেও আমি প্রদ্যুম্নের অফিশিয়াল স্ত্রী হিশাবে দিতে পারি না। সে আমাকে খাওয়াবে পরাবে, বিলাসব্যসনের সমস্ত ব্যবস্থা করবে, অজস্র অর্থব্যয় করবে, আর আমি তারি ঘরে বসে আমি আমার স্বাধীন মন ও আত্মার, এ যথাসর্বস্ব শরীর একজনকে দেবো, দিয়ে তৃপ্তি পাবো, এ হতেই পারে না। তৃপ্তি যদি পাই, তাহলে তা ক্ষণিকের, আকস্মিক, দ্রুত, তারপরেই পরিবেশের চাপ আমার চাপ আমার সেই স্বাধীন সত্তাকে চেপে মারতে আসবে। এই কারণে প্রদ্যুম্নের ঘরে বসে, তার অগোচরে রাত্রির কুয়াশায় আদিমতার অরণ্যে বাসুদেবকে আমার শরীর দিতে পারি না, যারা দেয়, তারা নীচ, স্বার্থপর। পরের ওপরে খেয়ে জীবন চালাতে চায়। এবং প্রদ্যুম্ন যদি আমার স্বাধীনতার কথা জেনেও আমাকে থাকতে দেয়, আমার শরীর চায়, তাহলেও তার কাছে থাকতে পারি না। কারণ সংসারের জন্যে, খাবার জন্যে প্রদ্যুম্নের কাছে আমি দেহটা বেচছি, বেচে যে লাভ হচ্ছে, তা দিয়ে হয়তো বাসুদেবকে উপঢৌকন দিচ্ছি। এবং বাসুদেব এটা নেবে কেন? বাসুদেবের যদি স্বাধীন অস্তিত্ব থাকে, তাহলে আমাকে থাকতে দেবে কেন? এবং যদি পরিবেশের চাপের জন্যেই প্রদ্যুম্নের কাছে থাকতে হয়, তাহলে স্বাধীন বলে যে জোর গলায় চিৎকার করচি, তাহলে সেই স্বাধীন আমি নই। আর যদি স্বাধীনই না হলুম, তবে বশ্যতা স্বীকার করতে অপরাধ কোথায়? প্রদ্যুম্নের ভালোবাসায় যদি করুণা-পরবশ হয়ে থাকি, তবে আমাকে বেদনা পেতে হবে। আমাকে ছেড়ে যদি প্রদ্যুম্ন ব্যথা পায়, তাহলে সেই ব্যথায় ও মহৎ হবে, আমার জীবনের গ্লানি দূর হবে। জীবনের ক্ষেত্রে যদি শরীরটাও প্রধান হয়, যদি এটাই জেগে থাকে, এটাই চরম সত্য হয়, স্বীকার করি হতে পারে, তাহলে এতো বেদনা ব্যথা সৌন্দর্য বিরোধ বাস্তবের সত্য আসে কেন? দেহ পেয়েই তো আমরা এক থাকতে পারি, যা এখনো আছি, তবে আর বাসুদেবের

মধ্যে বিরোধ? প্রেমিককে দেহ দিয়ে পরক্ষণেই ভালোবাসায় টানে মুক্ত হওয়া যায় কি, হয়তো যায়।

'তুমি আমায় ডেকে এনে কি ভাবছো?'

'না কিছুই ভাবছিনা, কি হাসছো।'

'এমনি।'

'বাসু, নদীর জলটা কেমন কালো হয়ে এসেছে, জলের নীচে কিছু আছে বলে মনে হচ্ছে না, ওপরে একেবারে সমান, মনে হচ্ছে কালো পাথরে আমরা লাফাতে পারি।'

'ছোটবেলা থেকেই জলের প্রতি তোমার মোহ, জলকে তুমি এতো ভালোবাসো কি করে।'

'কি জানি, বাসু, জলের কাছে এলেই মনে হয় আমি মুক্ত। কতোদিন মনে হয়েছে, এই শীর্ণ নদীর জলের নীচে, এখানে একা জলে ডুবে বসে থাকি, জলের স্রোতে আমার স্রোত মিশে যায়। কিন্তু স্বামী আমার শাসক, তাই পারি না। লোকে বলবে কি।'

'লোকে বলবে কি!?'

'হ্যাঁ, সকলের চোখে তো আমার দিকে তাকিয়ে হাঁ ক'রে থাকে।'

'তুমি কিন্তু আগে লোকের কথা কোনো গ্রাহ্যই করতে না।'

'লোকের কথা গ্রাহ্য না করলে জীবনে আমাদের মুক্তি কবেই হতে পারতো। ইচ্ছেই যদি সব হতো, কাজটা যদি নগণ্য হতো তাহলে তো ইচ্ছের ভর করেই জীবন চলতো পারতো, যেহেতু কাজটাই মুখ্য, সেইহেতু কাজের প্রতি অবহেলা করতে পারি না। বিয়ের আগে স্বামীস্ত্রী মিলনের স্বপ্ন দেখে, সেই স্বপ্নই কি কাজের সত্য।'

'দেখেছ সুলতা, ওপারে বনের ধারে অন্ধকার শিকার খুঁজছে।'

'চলো বাসু, তুমি আমি জলের ওপর হাঁটি। এই নদী এঁকে বেঁকে সাপের মতো কোথায় চলে গেছে। শুকিয়ে যাচ্ছে, তবু এই নদী। মাঝে মাঝে মনে হয় বাসু, আমিও এই নদীর মতো কোথায় যেন বালুর চরে হারিয়ে যাচ্ছি। তাই এই নদীটাকে দেখতে আসি। ওর জলে

আমার প্রাণের জল চলকে ওঠে।'

আমরা দুজনে হাত ধরাধরি করে নদীর জলে পা ডুবিয়ে হাঁটছিলুম। আমার শাড়ি ভিজে যাচ্ছে, হাঁটু ডুবে যাচ্ছে, জলের সঙ্গে আমি ডুবে যাচ্ছি, শীর্ণ নদীটা আমার স্পর্শে তরঙ্গায়িত হয়ে উঠেছে, বাসুদেবের হাতের স্পর্শে আমার রক্তে আলোড়ন আসছে। একদিকে আমি নদীর জলের গভীরে আমার সত্তাকে মিশিয়ে দিয়ে শীতলতা পাচ্ছি, সত্তা মিশে যাচ্ছে, স্রোতে আমার স্রোত মিলে যাচ্ছে, অন্যদিকে বাসুদেব আমাকে চেতনায় স্পর্শ করছে, চৈতন্যময় আলোর শরীর নিয়ে রাত্রির অন্ধকারে আলোর নৌকার মতো ভাসছি।

ওপারে স্তব্ধ বনটা হুমড়ি খেয়ে গুমড়ে পড়ে আছে। মনে হচ্ছে ওর বুক থেকে যেন সোনার বেদনা জোর করে বার করে নিয়ে গেছে। আমি জানি, ওর মধ্যে গেলে বনটা নড়ে উঠবে, আমাকে পেতে চাইবে, আমার চেতনায় মিশে যাবে। আমি ওর আদিম বন্যভাবকে জাগিয়ে দিতে পারবো। চারদিকে অন্ধকার হয়ে এসেছে, প্রকৃতি আঁধারে ঝাপসা,নদীর জলের বুকে কান্নার আলোর মতো তারা, শুকনো বালুচরে কালো জ্যোৎস্না গুমড়ে মরছে, স্তব্ধ বাতাসে প্রাণ নেই, কিন্তু প্রাণহীন বনানীর অভ্যন্তরে কার যেন বেদনার কান্না, তাকে আমি শুধু শুনছি, বাসুদেব উদাসী হয়ে ওপরের দিকে তাকাচ্ছে, আমার স্পর্শে ওর কোনো চেতনা প্যাশন আবেগ জাগছে কিনা জানিনা, কারণ কোনো প্রকাশ নেই, কিন্তু আমি আমাকে খুঁজে পেয়েছি। নদীর স্রোতে আমি অনায়াসে ভেসে যেতে পারি, শীর্ণ নদীটাকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে উচ্ছ্বসিত আবেগে ভাসিয়ে দিতে পারি।

কিন্তু, কিন্তু ; না বাসুদেব এতো নির্বিকার কেন ! ওর হাত ও সরিয়ে নিচ্ছে না, তবু সে হাত থেকে কোন স্পর্শ পাচ্ছি না। কিন্তু আমি কি অন্যায় করছি। প্রদ্যুম্ন আমাকে চায়।

তাতে আমার কোনো ক্ষতি নেই। আমার এই মুহূর্তে মনে হচ্ছে বাসুদেবের হাত ধরে এই নদীর বুকে শুয়ে নদী হয়ে পৃথিবীর সকল

বস্তুকে আমি স্থান দিতে পারি। সকলে আমার কাছ থেকে আনন্দ টেনে নিতে পারে, আমি এই বিশ্বপ্রকৃতির মতোই প্রাণের প্রবাহে অগ্নিমন্ত্র। প্রত্যুম্ন তার জ্বালা নিয়ে, তার হতাশা নিয়ে, তার ওই প্রচণ্ড শক্তি দিয়ে আমাকে কিছুতেই সরিতে নিতে পারবে না, হারিয়ে দিতে পারবে না। পাপপুণ্যের ন্যায়অন্যায়ের বিরোধ আমার মধ্যে নেই, আমি যেন এই বনমর্মরে বেদনার কান্নার সুর, এই সুর বুকে নিয়ে সকলে কাঁদতে পারে, ঘুমুতে পারে।

'কিন্তু বাসুদেব, বাসুদেব তুমি কথা বলছ না কেন ? বাসুদেব।'

'আমাকে এমনিভাবে থাকতে দাও, আমার চেতনা যেন অন্ধকারে চেপে আসছে, আমার শরীরটার মধ্যে কিসের ভূত যেন নড়ে উঠছে। তাকে আমি দূরে সরিয়ে দিতে চাই। দুজন এলেই মৃত্যুর ছায়া দোলে।'

'তুমি ভীরু বাসুদেব।'

'ভীরু নই, আমি একার মধ্যে দুই পাখির কান্না শুনতে ভালোবাসি।'

'কিন্তু আমি, আমি যে তোমাকে ভুলতে পারি না।'

'আমি কি পেরেছি ?'

'তবে এত ভয় কেন।'

'হারিয়ে যাবার ভয়। কিন্তু না, হারিয়ে যাবে না।'

'যাবে, যেতে হয়, শরীরের অস্তিত্বে থাকে, আর কিছু থাকে না।'

'তবুতো থাকে, চেতনার পরিণাম যদি শরীর হয়, তাহলে আপত্তি কোথায়, শরীর থেকেই তো চেতনার জন্ম !?'

'সত্যি বলছ ?'

এই প্রথম বাসুদেব আবেগভরে আমার হাতের মুঠো জোর করে চেপে ধরলো, এমনিভাবেই ধরে রইল। সমস্ত বনানী, জলস্থল বাতাসে কোন শব্দ নেই। নিঃশব্দ এই প্রকৃতির বুকের মাঝখানে আমরা শুধু হৃদ্‌পিণ্ডের চেতনা জাগিয়ে অধীর আগ্রহে চেয়ে আছি। আমাদের চেতনায় সমস্ত বিশ্বপ্রকৃতি চৈতন্যময় হয়ে উঠবে। জোনাকির

আলোয়, শেয়ালের চিৎকারে, ঝিঁঝির ঝিমধরা ডাকে, অস্পষ্ট বাতাসের শব্দে, জলের কাঁপনে, বালির শাদা পালকের তরঙ্গে আমাদের চেতনা ছুঁয়ে আছে।

জানিনা, আমরা কতক্ষণ এমনিভাবে শান্ত কালো স্তব্ধ জলের মধ্যে হাঁটু ডুবিয়ে নীরবে দাঁড়িয়ে ছিলুম; কারণ আমরা চেতনার মধ্যে বিবশ হয়ে গিয়েছিলুম। কিন্তু হঠাৎ জিপের চিৎকারে, তার তীব্র আলোর ঝলকানিতে, আমাদের নিস্পন্দ শরীর জেগে উঠলো। আলোটা আমাদের মুখের ওপর পড়ল। তারপর দ্রুতগতিতে এগিয়ে এলো, একেবারে জলের ধারে এসে থমকে দাঁড়ালো। আমি তাড়াতাড়ি বাসুদেবকে টেনে নিয়ে ওপরে এলুম। বাসুদেব আমাকে ছাড়িয়ে নিল, বললো; আমি যাচ্ছি! আমি জানি প্রত্যুম্ন জিপে এসেছে, এখনি ফেটে পড়বে। পড়ুক! ফেটে পড়ার অধিকার ওর আছে। জানি, এমন সব কথার অবতারণা করবে, তাতে বাসুদেব ক্ষুণ্ণ হবে। কিন্তু আমি ক্ষুণ্ণ হবো না, আজ আমার ক্ষুণ্ণ হবার কোনো ভয় নেই। আশঙ্কা নেই, হতাশা নেই। জলের গভীরে প্রত্যুম্নকে সঙ্গে করে আমি বাসুদেবকে নিয়ে থাকতে পারি। আমার মধ্যে সমগ্র প্রাণ কথা বলে উঠেছে। প্রত্যুম্নের হিংসা দ্বেষ কোনো কিছুই আর আমার কাছে বিসদৃশ লাগছে না।

প্রত্যুম্ন সিগারেট টানতে টানতে জিপ থেকে বেরিয়ে এলো। নদীর ওপরে বনের দিকে তাকিয়ে বনের মত্যে থমকে দাঁড়ালো, বুট দিয়ে আলগা বালি জলের মধ্যে ফেলে দিলো, নদীর ওপরে দৃষ্টি ফেললো, স্তব্ধ হয়ে সিগারেটটা জলে ফেলে দিতেই আগুনটা চুপসে গেল। বললো; বাসুদেববাবু, এতো রাত্রে এখানে! মানুষের ভয় নেই জানি, কিন্তু প্রাণের ভয় তো থাকতে পারে।

বাসুদেব কোনো কথা বললো না। আমি বললুম; আমাদের প্রাণের ভয় নেই।

ওঃ, প্রত্যুম্ন বড়ো জোরে গাড়ি চালাচ্ছে, মনে হচ্ছে উল্টে পড়ে

যাবো, মনে হচ্ছে বাসুদেবের সঙ্গে বেরিয়ে আসবার জন্যে প্রতিশোধ নিতে চাইছে। বেশতো, এই প্রতিশোধে যদি আমরা এক সঙ্গে মরে যাই, তাহলে আমার বেদনায় পরম মুক্তি হলো, এবং প্রদ্যুম্ন শান্তি পাবে। কিন্তু প্রদ্যুম্ন আমাকে চায় কেন, ওর এই যৌবনদীপ্ত সুন্দর চেহারায় যে কোনো নারীকে সে আকর্ষণ করতে পারে, কিন্তু সে আমাকেই চায়, আমার মধ্যেই ভালোবাসার তীব্রতা অনুভব করতে চায়, আমার নিস্পৃহ শরীরটাকে টেনে নিয়ে ওর মধ্যে থেকে আত্মার নির্যাস বার করতে চায়, বস্তুর মতো একান্ত নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে আমাকে সরিয়ে দিতে পারে না।

কিন্তু আমি কি বাসুদেবকে ভালোবেসেও প্রদ্যুম্নকে সন্তুষ্ট করতে পারি না, আমার শরীর দিয়ে ব্যবহার দিয়ে সেবায় যত্নে আতিথেয়তায় ?

বাংলোর গেটে জিপটা থমকে দাঁড়াতেই আমরা সকলে পরস্পরের গায়ে হুমড়ি খেয়ে পড়লুম। প্রদ্যুম্ন নেমে গেল, আমরা কাঁকর-বিছানো পথ দিয়ে দুপাশের ফুলের গন্ধ নিয়ে কুকুরঘুমানো বারান্দা পেরিয়ে অন্ধকার ঘরে সুইচের জন্যে হাত বাড়ালুম।

প্রদ্যুম্নের আত্মকথা

ঝোলা লম্বা কোটের পেছনে আগুন লাগলে মানুষ যেমনি ছুটে পালিয়ে যায়, তেমনিভাবে পরের দিন অতি সকালে একাকী গোপনে বাসুদেব পালিয়ে গেল। সকালে ঘুম ভাঙতেই বিরহ রজনীর কান্না জগৎব্যাপী আছড়ে পড়েছে দেখলুম, শিশিরের মুক্তো জলের ওপর নিহত ছাপের কান্নায় ভাসছে, গেট পেরিয়েই কোথায় হারিয়ে গেল। হারিয়ে -যাওয়া পথিকের জন্যে কান্নার ধূসর আকাশে ত্যক্ত পাখির বেদনা আমার গোলাপকে কালো করে দেবে। সুলতার বুকে বেদনার গোলাপ ফুটবে, তাকে আমি দূর থেকে দেখে তৃপ্ত হবো, না তাকে ছিনিয়ে নেবো ? এই দ্বিধাই আমাকে মেরেছে, আমার সত্তাকে কলুষিত করেছে।

এ যদি চেনার আনন্দ হয়, তাহলে কি প্রাচীন গ্রীক নায়কের মতো আমি বলতে পারি সব ভালো, এই পরম তৃপ্তি কি আমার মধ্যে আছে? ইডিপাস দেহে মনে শান্ত হয়ে নীতিবোধের ও সমাজের চাপে ক্ষতবিক্ষত হৃদয়কে ঐ সান্ত্বনায় ভুলিয়েছিল, কিন্তু আমার যে কিছুই নেই, সমাজকেও মানি না, নীতিবোধ একটা ধূসর মরুভূমির মতো আমার চিত্তের গহ্বরে হাঁ করে আছে, তার তাৎপর্য হারিয়ে গেছে। আমার হাহাকার যে শূন্যতার, না-পাওয়ার, বেদনাবিদ্ধ আকাশের বজ্রের মতো শুধু ডাকছে। এই ট্রাজিকবোধ থেকে মুক্তি কোথায়, না, এই ট্রাজিকবোধ ও উপলব্ধির মধ্যেই আমার মুক্তি? সুতরাং আমার কোনো সাহস নেই, আছে শুধু বোধ। আমার বিশ্বজোড়া ক্ষুধার আগুনে আমি সকলকে গ্রাস করতে চাই, কিন্তু আমি নিজেই গ্রাসিত হয়ে যাচ্ছি।

সুলতা ঘুম থেকে উঠেই আমার ঘরে ছুটে এসে ত্রস্ত বিদ্যুতের মতো জ্বলে নিভে গেল। বুঝি-বা জ্বলতে গিয়ে সমাজের আবৃত তার একটুখানি ছিঁড়ে গেল, ছেঁড়া রাবারের ভেতর দিয়ে নূতন তারের অদ্ভুত দীপ্তির কান্না দেখে চমকে উঠলুম। কিন্তু মুখে কোনো কথা প্রকাশ করলুম না। চারদিকে তাকিয়ে কাপড়টা বুকের ওপর ঠিক করে নিয়ে দুলতে দুলতে আমার চোখের সামনে দিয়ে চলে গেল।

এখুনি বিশ্বজোড়া কাজের তাগিদ আসবে। মনে হলো, পাশের নদীটাকে একবার দেখে আসি। জীর্ণ মরে-যাওয়া বালির চরে মুখ থুবড়ে-পড়া নদীর কালো দেহে সকালের তরুণ রৌদ্র কামনার আলিঙ্গনের শুভ্রতা জাগছে, শুদ্ধ জলে আকাশের হৃদয় ভাসছে, অথচ ভেতরে শ্যাওলার পাহাড় ওত পেতে আছে। মনে হলো, কাল যেখানে সুলতা ও বাসুদেব একত্রে বসে নদীর জলের উষ্ণ স্পর্শ নিয়ে হৃদয়ের শান্তি প্রার্থনা করেছিল, সেখানে যাই, এখনো সুলতার গন্ধে বোধ হয় জলের প্রাণ নড়ছে, আলোবাতাস শিশির রোদ্দুর সব মিলে তাকে আরো নিবিড় করে তুলেছে। না, এ আমার সাজে না। তবু মনে হয়, নদীটা সময়ের মতো মরে গিয়ে বেঁচে আছে অন্তরে। সব কিছু ছুঁয়ে আছে, কিন্তু

স্থির হয়ে নেই।

আমার বাগানের চারপাশে ঘুরে বেড়ালুম। দেখলুম, গাছে গাছে তরুণ সবুজ আভা ছড়িয়ে পড়েছে। তার ওপর আলো চিকিয়ে যাচ্ছে। রৌদ্র ঝলোমলো আকাশের দিকে তাকিয়ে মনের মধ্যে অজানা বিরহের কান্না গুমড়ে ওঠে, নীল আকাশে শাদা মেঘের ওপর চোখ পড়লেই মনে হয় কোথায় আমার যাত্রা আরম্ভ হয়ে গেছে, এখান থেকে বিদায় নিতে হবে। আসলে আমার জগৎ থেকে সরে যাবার উপায় নেই।

সকালবেলা ডাক আসতেই দেখি বাড়ি থেকে চিঠি এসেছে। বাবার শরীর খুব খারাপ। মরণাপন্ন, হয়তো আজকালই মারা যেতে পারে। এখুনি যেতে হবে। কিন্তু চিঠিটার মধ্যে আবেগ উদ্বেগ শঙ্কা খুব একটা প্রকাশ পায় নি। সুলতাকে কিভাবে বলা যায়। না, সুলতা যদি না যেতে চায়, তাহলে এখানেই থাক। ওর মনের আঁধারে ডুবে গিয়ে শান্ত মনে কান্নার জলে ভাসুক। সেই তপ্ত নদীর জলের গভীরে শান্তির আশ্বাস নিতে থাকুক। ওর শরীরের পাপড়ির ভেতরে বেদনার শিশির পূর্ণ হয়ে উঠুক। কিন্তু আমার শুধু দুঃখ পাওয়া ছাড়া কোনো সান্ত্বনা নেই? দুঃখ পাওয়াটাই হয়তো আমার নিয়তি। একে নিয়ে বেঁচে থাকাই জীবনের সার্থকতা। শোবার ঘরে গিয়ে সুলতা আপন মনে সকালের ঝরা-শিউলির গন্ধে গুনগুন করে গান গাইছে। গান শুনতে ভালই লাগে, কিন্তু এই পরিস্থিতিতে কেমন যেন লাগছে, বললুম; বাবার মুমূর্ষু অবস্থা। আমার সঙ্গে কি যাবে? প্রথমে কোনো কথা বললো না, তারপর কি মনে করে বললো ; যাবো। এ. ডি. এম্.কে ব্যবস্থা করে কলকাতার দিকে রওনা হলুম।

বাড়িতে গিয়ে অবাক। বাবা আগের মতোই আছেন। তবে এরকম চিঠি দেবার কি দরকার? রেগে মা'কে বললুম, এটা কি রকম ব্যাপার? মা বললো ; অবস্থা সত্যি কাল খারাপ হয়েছিল, আজকে একটু ভালো আছেন। আর তোকে দেখতে চান, কিন্তু মুখে বলেন না।

সুলতা কলকাতার বাড়িতে এলে ভুলে থাকে, তাকে আর পাওয়া যায় না। বাবাকে দেখতে যেতেই বাবা প্রশ্ন করলেন, একটা ঝামেলায় পড়েছ। কিসের ঝামেলা, আমি কি কাউকে বলবো?

—চাকরি করতে গেলে তো একটু ঝামেলা পোয়াতেই হবে।

—না, সে রকম ঝামেলা নয়। শুনছি মন্ত্রীর সঙ্গে বিবাদ বাধছে।

—মন্ত্রীর সঙ্গে আমার কোনো বিবাদ নেই, মন্ত্রীর পুত্র বনের মধ্যে আমার অনুমতি ছাড়া পশু শিকার করেছে। সুতরাং তাকে শাস্তি পেতে হবে। কারণ পশু-শিকার বনে নিষিদ্ধ। নিরীহ প্রাণী হত্যা করেছে।

—নিয়ম-মাফিক কাজ করা ভালো, কিন্তু নিয়ম কি কাজের বেলায় চলে? কারণ অনবরত আপোশ করতে হয়। প্রকৃত নিয়ম মতো চলতে গেলে যার অসুবিধে হবে, সেই আজ জনতা লেলিয়ে দেবে। কারণ, জনতাই সর্বশেষ শক্তি, , এবং তাকে লেলিয়ে দেওয়া খুব কষ্ট নয়, অন্তত আমাদের দেশে। তাই তোমাকে একটু সাবধানে চলতে বলছি। হয়তো কি করতে কি করবে? নতুবা বলো, আমি কি করতে পারি।

—সাবধানে চলে কোনো লাভ নেই, কারণ ভয়টাকে এরা অনেক মূলধন করে কাজে লাগাতে চায়। আর নিয়ম যা আছে, তাকে আমি কাজে লাগাবোই। সকলেই কাজ না করে উন্নতি পায়, দেখিই না একটু কাজ করে কতো অবনতি হয়। আমার হাতে ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও আমি যদি একে কাজে লাগাতে না পারি, তাহলে আর কে লাগাবে।

বাবা আর আমার সঙ্গে কোনো কথা বললেন না; জানেন, বলেও কিছু হবে না। তবু আসবার সময় আর একবার সাবধান করে দিলেন। বললুম; আপনার শরীর কি খুব খারাপ? দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করে বললেন, আমার আর শরীর, আজ আছি তো কাল নেই। তবে আমার অনেক কাজ বাকি রয়ে গেল, শুধু মনে মনে পরিকল্পনাই করে গেলাম। তা আর শেষ হলো না, আর বলেও কোন লাভ নেই, কেউ শোনে না, এবং শুনলেও সেই মতো কাজ করে না। ভালো ছাত্রেরা ভালোভাবে মুখস্থ করে বটে, ভালো চাকরি পেলে এ সব ভুলে যায়,

শুধু নিজের স্বার্থসিদ্ধি, এ ছাড়া কোনো চিন্তা নেই। যে যতো আত্মপর, সে ততো ভালো চাকুরে। মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে এসে মনে হয় বৃথাই হলো শিক্ষা দেওয়া, যে শিক্ষা দিই, তার একটা দূষিত পথ ধরে তাকে বিকৃত করে তোলাই এখানকার রীতি। একটু থেমে বললেন; তোমার সম্বন্ধে আমার ভয়, তুমি ঐশ্বর্য বীর্যে প্রবল বিশ্বাসী, মন ও বুদ্ধি দুই-ই আছে, কিন্তু তাতে ভেদ তৈরি হবে যদি সামঞ্জস্য করতে না পারো। প্রদ্যুম্ন, ভুলো না, যদিও তুমি স্বাধীন দেশের শাসক, কিন্তু স্বাধীন দেশের মন পাওনি। সে মন আসবে কিনা জানি না। তাই তোমার বিপদ হলে কেউ তোমাকে সাহায্য বা রক্ষা করবে না, যারা পাশে ছিল তারাই হাসবে। তোমার সম্বন্ধে আমার আশঙ্কা হচ্ছে। শুয়ে শুয়ে তাই ভাবি।

বাবার এ সব আক্ষেপের কথা অনেকবার শুনেছি। তাই নিরুপদ্রবে তাঁর ঘর থেকে চলে এলুম। বাবাকে দেখে মনে হয় সেই সাংখ্যের রূপক কাহিনীর নায়কের মতো, চলৎশক্তি নেই, চলতে পারছেন না নিজে, কিন্তু মাথা দিয়ে সব কিছু ভাবছেন। সমস্ত জ্ঞান তাঁর মাথার মধ্যে স্তব্ধ হয়ে আছে। বাবার মতো এই জ্ঞান আমার নেই, আমি আয়ত্ত করতে চাইও না, কারণ তাহলে আমাকে এমনি পঙ্গু হয়ে থাকতে হবে। গভীর অসুখে পক্ষাঘাতে বাবার নিম্নাঙ্গ অবশ হয়ে গেছে। বসে থাকেন, আগে দু'চাকা ঠেলে যাতায়াত করতেন, কিন্তু মাথার কাজ ঠিক মতোই চলেছে। জ্ঞানশক্তি আমাদের কর্মশক্তিকে বিনষ্ট করে দেয়। সাংখ্যের পুরুষের মতো বাবা তাই বসে বিশুদ্ধ জ্ঞানের কথা বলে যাচ্ছেন; ভাবছেন, তিনিই চালাচ্ছেন।

বাবা একটু চুপ করে থেকে বললেন; তোমাকে বলতে ভুলে গেছি। অনিরুদ্ধ ফোন করেছিল, তোমার সঙ্গে কি দরকার, দেখা করতে চায়।

প্রথমে চিনতে পারলুম না কে অনিরুদ্ধ। হাঁ করে তাকিয়ে রইলাম কিছুক্ষণ। বাবা বুঝতে পেরে বললেন; তোমার ক্লাশমেট, তোমার কিছু পরামর্শ চায়।

অনেক চিন্তা করে হঠাৎ মনে পড়লো, হ্যাঁ, অনিরুদ্ধ অনিরুদ্ধ, এতো দীর্ঘ দিন পরে আমার সঙ্গে ওর কি দরকার! মুখে বললুম, আচ্ছা আমি থাকবো। দুপুরে সুলতা জোর করে শম্ভু মিত্রের 'রাজা' দেখবার জন্যে ধরলো, কিন্তু অনিরুদ্ধ আসবে, আর নাটকের এ সব ইলুসন আমার তেমন ভালো লাগে না। মনে আছে, একবার রাজা দেখতে গিয়ে টিকিট না পেয়ে ফিরে এসেছিলুম, এতো ভিড়, চারদিকে ছবি স্কালপচার; ছবির মতো মেয়েরা, খোঁপায় গোড়ের মালা পরে স্তব্ধ গাছের ছায়ায় ত্রস্ত পদে ঘুরে বেড়াচ্ছে, হাতে চাঁপার ফুল, পুরুষের থেকে মেয়েদের ভিড়ই বেশি। কি জানি, আমার মনে হলো, নাটকের অর্থ যতো না বুঝুক, নাটক দেখার আনন্দ উপলব্ধি না করুক, শম্ভু মিত্রের 'রাজা' দেখছি, এতে একটা আভিজাত্য বোধের সুখ আছে। যেগুলি না করলে না দেখলে বুদ্ধিজীবী হওয়া যায় না, অভিজাত সমাজে মেশা যায় না, সত্যজিৎ রায়ের ছবির সমালোচনা ও রসোপভোগ, শম্ভু মিত্রের নাটকাভিনয় দেখা। সুলতার কথায় কান দিতে পারলুম না। আর ছুটির দিনে টিকিট পাওয়াও অসম্ভব। কারণ রাজা চলে গেলেও রাজার অনুষঙ্গ তো আমাদের মুগ্ধ মনের কামনায় লুকিয়ে আছে, অন্ধকারের গাছের শাখায় ফুল ফোটায়, এই রাজা ধর্মেরই হোক, আর বাস্তবেরই হোক। বাস্তব থেকেই তো ভগবৎ উপলব্ধির মধ্যে উত্তীর্ণ হয়েছি, আর রবীন্দ্রনাথ রাজার ব্যাপারে পুরো সামন্ততান্ত্রিক। একটা রাজা না থাকলে ওঁর কল্পনা কিছুতেই পূর্ণতা পায় না যেন। আসলে নিজেরা রাজা না হই, এমনি রাজার সংস্পর্শ আমরা সকলে কম বেশি অনুভব করতে চাই, আর এরকম রহস্যময় রাজা, যার আবির্ভাবে, কথায় এক অনির্বচনীয় রহস্য আমাদের চিত্তকে রোমাঞ্চিত করে তোলে। সেখানে আমরা বিচারক নই, মুগ্ধ দর্শক। সুতরাং আমি যদি ঐশ্বর্যবীর্যে এই শক্তি কিছুটা অধিকার করতে চাই, তাহলে অপরাধ কোথায়!

কিন্তু সুলতা তো অভিনয় দেখে না, দেখতে চায় না, 'রাজা' দেখতে চায় কেন, ওর মনের গভীরে অন্ধকারে আঁধার বাণীর গন্ধের বেদনা কি

বাসুদেবের জন্যে উন্মুখ হয়ে আছে! তাকেই ও অদৃশ্য রাজার আবির্ভাবে উপলব্ধি করতে চায়, হয়তো ভাবে কোনোদিন দেখা দেবে। সুলতা এক সময় গান গাইতে পারতো, রবীন্দ্রসংগীত ভালো গাইতো, ওর গানের সঙ্গে অনুভূতি এক হয়ে গেছে। ও হয়তো বাসুদেবের অস্তিত্ব অন্ধকারে অনুভব করে সুদর্শনার মতোই বলতে চায়; 'আমার মধ্যে তোমার প্রেম আছে, সেই প্রেমেই তোমার ছায়া পড়ে, সেইখানেই তুমি আপনার রূপ আপনি দেখতে পাও। সে আমার কিছুই নয়, সে তোমার।'

সারাদিন এমনি সময় চলে গেল। সুলতা মাঝে একবার শুধু দেখা দিয়েছিল। বাবাকে দেখে মনে হয়, জীবনের সঙ্গে জীবনের কোনো যোগ নেই, বই কি জীবনের কথা বলে, জীবন অনেক বড়ো। বাবার আদর্শেই সে ভালো ছেলে সেজেছিল। কোনো দিন সেকেণ্ড হয় নি। প্রেসিডেন্সি কলেজের মেয়েরা আমাকে নিয়ে কতো অত্যাচার করবার চেষ্টা করেছে, ভোলাতে চেয়েছে, প্রথমে সে ভোলে নি তা নয়, কিন্তু স্থায়ী হয় নি। বেশ মনে পড়ে শোভনা, কোনো ডেপুটি সেক্রেটারির মেয়ে, গাড়ি করে আসতো, একদিন গাড়িতে লিফ্‌ট দিয়েছিল, গাড়িতে বসলো, প্রদ্যুম্ন তুমি এতো শাই কেন। চুপ করে ছিলুম। এ কথার কোনো মানে হয় না। গাড়ি থেকে নেমে যাবার সময় হাত ধরে বলেছিল, আমাদের বাড়ি মাঝে মাঝে আসতে তো পারো। বেশ হৈ হৈ করা যাবে। তখনো চুপ করে ছিলুম আমি!

অনিরুদ্ধর কথা মনে হতেই সেই স্মৃতি মনে পড়ে। শোভনা চুল ছেঁটে ছোট করে দিয়েছে, ঘাড়ের কাছে একটু তরঙ্গ উঠেছে। তেলহীন চুলের মসৃণতায় রোদের আভা পিছলে পড়ে যেন। ঠোঁটে সামান্য রুজ, লাল ঠোঁট আরো লাল দেখাচ্ছে, হাত-কাটা উঁচু করা ছোট ব্লাউজ, সারা বাহুর মধ্যে নমনীয়তা, সিল্কের শাড়ি পরনে, মাঝে মাঝেই গা থেকে কাপড় খসে যায়। মুখে চোখে দীপ্ত বুদ্ধির প্রখরতা। শোভনা যখন তার হাত ধরে, তখন একবার কেঁপে

উঠেছিল। তারপর নিজেকে সামলে নিয়ে বলেছি, চলি শোভনা, কাল দেখা হবে। একটা বই পেয়েছি নতুন, আজকেই শেষ করতে হবে।

বই তখন ছিল প্রাণ, কিন্তু আজকে বইয়ের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই, বই হাতে নিলেই মনে হয় মৃত আত্মা শুয়ে ভয়ে চোখ দেখায়।

সন্ধ্যাবেলা ঠিক সময়ে অনিরুদ্ধ এলো। প্রথমে চিনতে পারি নি। দীর্ঘ আট-দশ বছর বাদে দেখা। সেই পঞ্চাশের পর থেকে আর পরিচয় ও দেখা শোনা নেই। কিন্তু অনিরুদ্ধের একি চেহারা, ভয় হলো! আমাকে দেখে গম্ভীর গলায় বললো; কিরে চিনতে পাচ্ছিস্। সেই যে শোভনা।

হায়! শোভনা আজ কোথায় হারিয়ে গেছে। শোভনা এখান থেকে ইংরেজিতে ফার্স্ট ক্লাস পেয়ে অক্সফোর্ডে যায়, সেখানে এম. এ. পাশ করে চাকরি করে, ওখানেই এক ইংরেজ চিত্রকর ভদ্রলোককে বিয়ে করেছে। ছেলেপুলে নিয়ে ভালোই আছে। এমন শোভন সংসারে অনিরুদ্ধ কি করতে চায়! শোভনার মতো সুন্দরী আমাদের ক্লাশে কেউ ছিল না। তাকে পাবার জন্যে একটা ভালো ছেলে তো দেবদারু গাছের নীচে বসে বসে পাগল হয়েই গেল। পাগল অবস্থায় মারাত্মক কবিতা লিখতো, শুনেছি বছরের মধ্যে দুবার নাকি তাকে উন্মাদাশ্রমে যেতে হয়। সেই শোভনারই আর এক প্রার্থী অনিরুদ্ধ। আমার প্রতি শোভনার অন্তরঙ্গতার কারণ মিলনজনিত ছিল বলে মনে হয় না। নাগরিক সভ্যতায় ওরকম মিষ্টি কথা হামেশাই বলতে হয়; পরে জেনেছি, দেহের ব্যাপারটাও, বিশেষ করে বলতে বলতে চলতে চলতে হাত ধরা, ওটা ঠিক প্রেমের নয়। ওটা অন্তরঙ্গতার ভান করা; মনের সঙ্গে হৃদয়ের আত্মিক যোগ না ঘটলে ওই হাত ধরা-ধরির ব্যাপারটা জলে হাত ধুয়ে পরিষ্কার করে নেওয়া যায়, হাতে মুখে কোনো ময়লা থাকে না। আমার সঙ্গে আদিখ্যেতার কারণ আমার কাছ থেকে ইকনমিক্সের ভালো নোটগুলি

হাতিয়ে নেওয়া। জানতো, আমাকে টেক্কা দেওয়া সম্ভব নয়, যাতে এমনি করে দুর্বলতা গড়ে উঠতে পারে। মেয়েরা যতোই আন্তরিকতা করুক, আমি দেখেছি, পরীক্ষায় ভালো রেজাল্ট করবার জন্যে কি প্রাণপণ চেষ্টা, সেখানে একটা স্বার্থবুদ্ধি সক্রিয় সর্বদা। পরীক্ষায় দু-এক নম্বর এদিক-ওদিক হলে কেঁদে ভাসিয়েছে, চোখের জলে বন্যা ধরিয়েছে। অনিরুদ্ধকে দেখে সেই অতীতের কথা মনে পড়ছিল, কিন্তু আমার কোনো অতীত নেই, আমি স্থূলতার বর্তমানের মধ্যে মিশে গেছি। তাকে নিয়েই আমার বাসনার সমুদ্র উথলে ওঠে।

অনিরুদ্ধকে বসিয়ে হাসি মুখে বললুম; বোস, তারপর কি খবর! অনিরুদ্ধর চোখে বড়ো বড়ো গোল গোল রঙিন কাচের চশমা, সারা মুখে চশমাটাই জুড়ে আছে, চোখ দুটো ভালো করে দেখা যায় না, কিন্তু বেশ বড়ো বড়ো। বসে এক টিপ নস্যি নিলো, তারপরে একটা সিগারেট ধরিয়ে আমাকে দিলো, বললো; তোদের ওখানে বাসুদেব গিয়েছিল, ওখেন থেকে এসে আমার সঙ্গে দেখা করলো। একটা উদ্‌ভ্রান্ত পাগলের মতো। আমাকে বললো; আমার জন্যে পাশপোর্ট ব্যবস্থা করে দিতে হবে। আমি একটা অফিসের কাজে চলে যাচ্ছি। ও আমার মাসতুতো ভাই, হয়তো তোর স্ত্রী চেনেন, কারণ একসঙ্গে পড়েছে।

আমি কোনো কথা বললুম না, আমি কথা বলতে চাইনা। অনিরুদ্ধই বললো; তারপর সে চলে গেল। কোথায় যেন আঘাত খেয়েছে। তা প্রদ্যুম্ন, তুই বিয়ে করেছিস্, তোর স্ত্রীকে তো দেখালি না।

হেসে বললুম; তুই এলি কোথায়, বোস, আসবে এখুনি।

তারপর চোখ থেকে চশমা খুললো, কিন্তু ওর মুখের দিকে তাকাতে পারলুম না, চোখ দুটো বিরাট বড়ো মনে হচ্ছে, বেরিয়ে আসতে চায়, চোখের কোলের মাংস ফুলে উঠেছে। সাড়া দেহটা আঁসকে পিঠের মতো, দশাসই চেহারা, কিন্তু কেমন যেন বীভৎস, গলার স্বরে

অস্বাভাবিকতা, চোখে বিভ্রান্তি, বীভৎস দেখায় বলে সর্বদা চশমা পরে থাকে।

অনিরুদ্ধর এই অবস্থা দেখে ভয় হলো, বললুম ; তোর কি হয়েছে ? তাচ্ছিল্য করে বললো ; আর হয়েছে, হঠাৎ দেখি চোখ ফুলে বেরিয়ে আসতে চায়। এ হর্মনজাতীয় রোগ।

—তা তুই বিয়ে করলি না কেন ? তোর তো বিয়ে করবার প্রবল ইচ্ছে ছিল। হেসে অনিরুদ্ধ বললো ; ছিল বলেই তো আর করলুম না। মনের মতো মেয়ে পেলুম না। তারপর শোন, বাসুদেবকে প্লেনে উঠিয়ে দিয়ে আসছি, এই সময় দেখি অনমিতা, গাড়ি করে যাচ্ছিল, এখন একটা মেয়ে কলেজে পড়ায়, আমাকে দেখে গাড়ি থামালো, গাড়িতে উঠতে বললো, গাড়ি করে একটা চায়ের দোকানে ঢুকলুম, অনেক কথা হলো, জানিস প্রত্যুম্ন, অনমিতা বিয়ে করে নি। বললাম, কি বিয়ে করছ না কেন ? হেসে বললো, বুড়ি হয়ে গেছি এখন আর আমাকে কে বিয়ে করবে। আর ভালোই তো আছি, আমি তো আর পাগল হয়ে যাই নি। পাগল হয়ে যাবার কোনো লক্ষণই নেই। তারপর কি বললো জানিস, আমার দিকে তাকিয়ে বললো, অনিরুদ্ধ, আমি মেয়ে বলছি, তুমি যদি বিয়ে না করো তুমি কিন্তু বাঁচবে না। আমি হো হো করে হেসে উঠলাম। একটা মেয়ে বলে কি ! ভয় হলো, ওকেই বিয়ে করতে বলছে না তো। কারণ ও একবার আমাকে টেনেছিল। বললাম ; না, ও তোমার অনুমান। বিষাদভরা গলায় বললো ; জানো, আগের কথা মনে পড়লে কান্না আসে। অনেকক্ষণ আমরা চুপ করে রইলুম। আচ্ছা বাসুদেবের সঙ্গে তোদের কি হয়েছিল, মনে হলো নিজেকে নির্বাসিত করতে চাইছে। একা থাকতে চায়।

আমি চুপ করে রইলুম। অনিরুদ্ধই আবার বললো ; যাক্ গে সেই পুরনো কথা, তোর কাছে এসেছি একটা দরকারে। তুই আমাকে একটু সাহায্য করতে পারিস। ফিনান্সের মন্ত্রীকে ধরে আমার প্রমোশনটা করে দিস না কেন ? এই এ্যাসিস্ট্যাণ্ট হয়ে আর কতোদিন

কাটাবো। যদি বড়ো চাকরিই করতে না পারলাম তাহলে জীবনের কি মানে হয়।

আমার হাসি পেল, বললুম ; তুই আগের মতোই আছিস। সবই বড়ো বড়ো করবি। সেরা সুন্দরী বিয়ে করবি।

—তাইতো ভালো করতে পারলুম না বলে বি. এ. পাশ করবার পর আর পড়লুম না, ছেড়ে দিলুম, চাকরির পরীক্ষাতে ভালো করেছি। আর আমার মতো এখানে জানে-শোনে কে? না ভাই প্রত্যুম্ন, তুই আমাকে একটু সাহায্য কর। এমনভাবে দিন কাটানো যায় না।

ঠাট্টা করে বললুম ; তোর প্রমোশনের দরকার কি। টাকার কি প্রয়োজন। থাকিস্ তো একা!

—একা থাকি, তা টাকার প্রয়োজন নেই! আর থাকতে গেলে বড়ো হয়ে থাকাই দরকার। আমি যে বিয়ে করিনি, তারও কারণ ওই। সুন্দরী মেয়ে পেলাম না, যাকে চাইলাম, সেই শোভনা চলে গেল, জানলও না ওর জন্য আমি অপেক্ষা করে আছি। আর আমার ঘেন্না লাগে জানিস ভেবে কোনো অসুন্দরী মেয়েকে নিয়ে এক বিছানায় আছি। যার সঙ্গে রাত্রি বাস করবো সে যদি আমাকে ভোলাতে না পারে, তাহলে শোবার কোনো মানে হয় না। আমি তাকে পূজা করবো। এমন মেয়ে আমি দেখতে পেলাম না, আর ভালো চাকরিও তো করি না। যৌবনে কলেজে পড়ার সময় স্বপ্ন দেখেছি, ভালো চাকরি করতে হবে, তাহলে সেরা সুন্দরী আমার বৌ হয়ে আসবে। কিন্তু তেমন ভালো চাকরিই বা করলাম কোথায়। দেখতে দেখতে বয়েস চলে গেল, যেদিকে তাকাই, চারদিকেই শুধু শূন্যতা। বেশ তো, ভালো সুন্দরী মেয়ে বিয়ে করতে না পারি, কিন্তু ভালো চাকরি তো করতে পারি। তুই ভাই আমাকে একটু সাহায্য কর। এভাবে আর জীবন চালানো যায় না, জীবনটাকে এদিক থেকে অন্তত ভোগ করি।

—আমি বলতে পারি না, দেখি চেষ্টা করে। কিন্তু আমার কথা শুনবেই সে এমন মনে হয় না। কিন্তু তোর এই রোগ হলো কি

করে অনিরুদ্ধ।

—কি জানি কি করে হয়েছে? ডাক্তার বলছে থায়োরাইড গ্ল্যাণ্ডের অতিরিক্ত সিক্রেশন থেকে এই অবস্থা। ইনজেকৃশন দিচ্ছে, ওষুধ খাচ্ছি, কিন্তু কিছু হচ্ছে না। আজকালকার ডাক্তারও যে কি হয়েছে, কিছু না পারলেই বলে মন। বলে, মনকে শান্ত সমাহিত করুন, তাহলে আপনি কমে যাবে। বলে, যোগ-সাধনা করুন। সমস্ত শক্তি পাবেন।

—তোর বিয়ে না করবার ফলেই এমন ঘটেছে।

—হয়তো তাই। দেখেছি যোগসাধনায় ফল হয়। তুই ভুরুর মাঝখানে সমস্ত চিন্তা ও মনকে এক করে রাখলে সব শান্তি গভীর প্রশান্তি। আমি তারই অভ্যেস করছি, সব শান্তির সমন্বয় হচ্ছে। শোন, আমার কথা ভুলিস নি। এই কারণেই তোর কাছে এসেছি। আমাদের হরিপদকে চিনিস তো, সেই তোর কথা বললো, তাই তো সকালে তোকে ফোন করেছিলাম। তোব বাবা ফোন ধরলেন।

এমন সময় সুলতা চাকরকে সঙ্গে করে খাবার নিয়ে এলো। অনিরুদ্ধ হৈ হৈ করে উঠলো; একি, এতো খাবার কি হবে। আমি বললুম; তুই আমার স্ত্রীকে দেখতে চেয়েছিলি, ইনিই আমার স্ত্রী। সুলতা দু'হাত জোড় করে নমস্কার জানালো। অনিরুদ্ধ কোনো কথা বলতে পারলো না, থমকে গেল, ওর বাচালতা এক মুহূর্তে থেমে গেল। সুলতা কোনো কথা না বলে বাইরে চলে গেল। চলে যেতেই অনিরুদ্ধ যেন দম ছেড়ে বাঁচলো, বললো; বেশ সুন্দর তো তোর স্ত্রী! বাসুদেবও সেই কথা বলছিল।

বললুম; মিষ্টি খা।

—এতো মিষ্টি খেতে পারবো না, তুইও নে। আর আমার কথাটা ভুলিস নি। একদিন আমার ওখেনে আয় না তোর স্ত্রীকে নিয়ে।

আমি ঠাট্টা করে বললুম; তুই তো স্ত্রীর সঙ্গে কথাই বললি না। যাবো কি!

—আরে প্রথম পরিচয়। সে আর বলতে হবে না।

আবার একবার আমাকে মনে করিয়ে দিয়ে অনিরুদ্ধ চলে গেল। সেই অনিরুদ্ধ, যে অত্যন্ত সেক্সভারাক্রান্ত ছিল, মেয়ে দেখলে কাণ্ডজ্ঞান থাকতো না। কিন্তু ওর জীবনে নারী এলো না, রুদ্ধচিত্তের বুকে হাহাকার শূন্যতায় ফেটে পড়তে চায়। যে সুন্দরী রমণীকে প্রকৃতির মতো আলিঙ্গন করতে চেয়েছিল, সেই প্রকৃতি প্রতিশোধ নিচ্ছে ওর দেহে জরায়, কি বীভৎস চেহারা, ভাবা যায় না। মনে হয় কুৎসিত প্রকৃতিই যেন ওর দেহে বাসা বেঁধেছে, যাকে নিয়ে শুতে ওর ঘেন্না, তাকে নিয়েই ও দিনরাত ঘুরে বেড়াচ্ছে, তারই রূপ দেখাচ্ছে সে। ওর মধ্যে অনিরুদ্ধ হারিয়ে গেছে। এ যেন অনিরুদ্ধকে ঢেকে দিয়ে, ওর সেই ঘৃণাই বীভৎসরূপে বিকারের মধ্য দিয়ে দেখা দিয়েছে। এও নারীর সঙ্গে এক রকম সহবাস। অনিরুদ্ধ বুঝতে পারছে না, বুঝতে পারলেও বুঝতে চাইচে না।

ওর জন্যে ব্যথায় আমার চোখে জল এলো, আমি যেমন সুলতার সঙ্গে সংগ্রাম করে চলেছি অনবরত, অনিরুদ্ধও করছে, অন্যরূপে, ভিন্ন উপায়ে। তাই জরা থেকে মুক্ত হবার জন্যে, এই নারীর কাছ থেকে জয়ী হবার জন্যে, প্রমোশন চায়। লোকে যাতে এই বীভৎস রূপ না দেখতে পারে। ইস্ কি চেহারা কি হয়েছে! না, আর আমাকে ওর জন্যে চেষ্টা করতে হবে, অন্তত ওকে মুক্তি দিতে পারলে আমার মুক্তি কিছু হবে। আমরা সকলেই কমবেশি পরাজিত হয়ে আছি। শোভনা যেন শাপে অনিরুদ্ধকে বীভৎস করে দিয়ে গেছে। আর শোভনা কোথায় হারিয়ে গেছে কোন্ দেশে।

কিন্তু সুলতার কাছ থেকে বাসুদেব কি পেয়েছে, যার জন্যে সে দেশান্তরী হয়ে গেল। মানুষের পূর্ণতা পাবার জন্যে ছটফট করে না, সে কি সুলতার কাছ থেকে সব পেয়েছে! কিন্তু বাসুদেবকে কখনো আমি পাবো না। বাসুদেবের জন্যে ঈর্ষা হয়, ঈর্ষা হয় এই কারণে নয় যে সুলতা ওকে ভালোবাসে, সুলতার হৃদয়ের স্বীকৃতি ওর মনের মধ্যে, ঈর্ষা হয়, কেমন নির্বিকার, কেমন সংযত শান্ত, আর আমি অনবরত

সংগ্রাম করে চলেছি, এই সংগ্রামের শেষ নেই। এই দ্বৈত লীলার মধ্যে যে বিস্ফোরণ আছে, তাতে একপক্ষের ধ্বংস অনিবার্য, এবং তখন একজনকে নিজের মধ্যে পূর্ণ হতে হবে।

ইস্, আমি অনিরুদ্ধকে ভুলতে পাচ্ছি না, সেই সুদর্শন অনিরুদ্ধের কামী, জলদগম্ভীর শালপ্রাংশু, অনিরুদ্ধের কি অবস্থা হয়েছে। ওর সঙ্গে আমার একটা মিল আছে, অনিরুদ্ধ সংগ্রাম করে চলেছে, জয়ী হতে চায়, বিয়ে করে নি, নারী পায় নি, যেন তার চেহারাকে বিকৃত করতে চায়, কিন্তু এই বিকারকে অর্থের দ্বারা পরাজিত করতে চায়। ওর মনের ভাবটা এই যে অর্থে পদোন্নতিতে উঁচুতে উঠলে এই পরাজয়ের কোনো মূল্য নেই। কিন্তু আমরা অনবরত হারছি, শক্তি আমাদের হারিয়ে দিচ্ছে, শক্তির কাছে মাথা তুলতে পারছি না। স্থূলতাকে আমি কোন্ শক্তিতে পরাজিত করতে পারি! অনিরুদ্ধ তার অহংকার নিয়ে একা কাটিয়েছে, এই অহংকারের মধ্যে তার শক্তি ও তেজ রয়েছে, কিন্তু তবু সে হেরে গেছে, কারণ তার অহংকার তাকে বিবিক্ত করে দিয়েছে সর্বদা। এবং শেষে তার অস্তিত্ব পর্যন্ত হারিয়ে যাচ্ছে, হারিয়ে যাবার আগেও সে সংগ্রাম করতে চাইছে অনবরত।

এই সংগ্রামের জন্যেই ওকে সাহায্য করা দরকার।

পাশের বাড়ি থেকে দিলীপ রায়ের গান ভেসে আসছে, 'সেই বৃন্দাবনের লীলা অভিরাম সবই মনে পড়ে।'

বাড়ি গিয়ে অনিরুদ্ধ আবার ফোন করলো, কণ্ঠে চরম ব্যাকুলতা ও প্রত্যাশা। আমি আশ্বাস দিয়ে বললুম ; ঠিক আছে।

আমি অনিরুদ্ধকে আশ্বাস দিচ্ছি, কিন্তু আমাকে কে আশ্বাস দেবে। বাসুদেব কেন বিলেতে পালিয়ে গেল ?

কলকাতা থেকে ঘুরে এসে দেখি একটি লোক আমার জন্যে অপেক্ষা করছে। সামনে আসতেই চিনতে পারলুম, পাইপ টানছে, ধোঁয়া উড়িয়ে মিটিমিটি হাসছে, চুলগুলি ব্যাকব্রাশ করা, একটু পাক ধরেছে, ছোটখাটো হৃষ্টপুষ্ট চেহারা, প্যান্টকোট পরনে, টাইটা সুদৃশ্য, জুতোর

পালিশটাও জ্বলজ্বলে বেশ, ফিতে সুন্দর করে বাঁধা।

বাইরে মুখোশ পরতেই হয়, বললুম ; কে, বীরেন ?

কোনো কথা বললো না, চুপ করে রইলো হেসে, অনবরত ধোঁয়া ওঠাচ্ছে, চারদিক ধোঁয়ায় প্রায় ঢেকে গেল, অথচ সুন্দর তামাকের গন্ধ, দামি মিকচার।

—কি ব্যাপার, হঠাৎ তুই মফস্বলে এলি ?

—একটা দরকারে। আর তোর সঙ্গে দেখা করতেও। কি রকম দাপটে রাজত্ব করছিস, তা দেখতেও বটে।

—বাড়িতে খবর দিয়েছিস ?

—না, বেয়ারাকে বলে বাইরে বসে আছি।

—চ, ভেতরে চ। বীরেনকে নিয়ে ভেতরে চলে এলুম। সুলতা ঘরে কি করছিল, হয়তো বই পড়ছিল, ড্রয়িংরুমে বসিয়ে চাকরকে বললুম দিদিমণিকে সংবাদ দিতে। সুলতা অনেক দেরিতে এলো। মনে মনে ফুঁসছিলুম, কিন্তু বীরেন খুব খোশমেজাজের। কথা বলে কম, তবে নানান ধরনের কথা বলে। সরকারি কলেজের ভারী অধ্যাপক। জানি, কোনো সইটইয়ের ব্যাপারে এসেছে, বড়ো কোথাও কিছু করবে। নিজের থেকে আমি আর ওকে জিজ্ঞেস করলুম না। অনেকক্ষণ বাদে সুলতা এলো সাজগোজ করে। বীরেন সুলতাকে দেখে পাইপ কামড়ে তড়াৎ করে দাঁড়িয়ে হাতজোড় করে ধোঁয়া ছাড়লো। আমি বললুম ; আমার ক্লাশমেট, ইতিহাসের অধ্যাপক, হয়তো নামটাম শুনে থাকবে।

সুলতা হেসে চুপ করে বসে রইলো ওর সামনে। আমি বললুম ; আজ থাকবি তো ?

—না না, বাড়িতে মা একা। না গেলে ভাববে।

—তোর স্ত্রী কোথায়, আমাদের সুদেষ্ণাকেই তো বিয়ে করেছিস !

বীরেন হেসে চুপ করে ধোঁয়া ছাড়লো শুধু।

সুলতা কিছুক্ষণ বাদে হেসে বিদায় নিলো।

সুদেষ্ণা, বীরেন বললো, লণ্ডনে থাকে। আমি যখন কেম্ব্রিজে পড়তে যাই, তখন সুদেষ্ণাকে নিয়ে গিয়ে গিয়েছিলুম। ও ওখানে একটা চাকরি পেয়েছে, আমার ছেলেটাও স্কুলে পড়ে ওখানে।

—বাঃ, বেশ তো!

—হ্যাঁ। ছেলেটার পড়ার জন্যেই সুদেষ্ণা ওখানে আছে।

—তা তুই একা এখানে আছিস।

—ছেলেটির পড়াশোনার জন্যে থাকতেই হচ্ছে।

—কিন্তু তোর ছেলে কি এখানে আসবে?

—বড়ো হয়ে কি করবে সে ওই জানে। আমরা বাপ মা হয়ে ওর পড়াশোনা ভালো করিয়েছি এই সান্ত্বনা। এর চেয়ে বেশি কিছু নয়।

আমি কিছু বললুম না; বুঝতে পারছি, বীরেন লণ্ডনে যাবে তার জন্যে উমেদারি করি ওর ডিপার্টমেণ্টে ও চায়।

বীরেন বললো; সুদেষ্ণাকে দেখতে যাবো। কিন্তু ছুটি দিতে চায় না। আর পাশপোর্টও স্যাংশন করতে চাই না। আমি অ্যাপ্লাই করেছি, তুই একটু বলে দিলেই হয়, শুনেছি তোর সঙ্গে আমাদের সেক্রেটারির ভালো পরিচয়।

আমি চুপ করে রইলুম।

—আমি অ্যাপ্লাই করেছি, সুদেষ্ণার টি. বি. হয়েছে তাকে দেখতে যেতে চাই

—টি. বি. হয়েছে?

—হ্যাঁ, তা না লিখলে আমাকে যেতে দেবে কেন?

সুলতা এর মধ্যে চা, অমলেট, কেক, বিস্কুট, কিছু ফল পাঠিয়ে-দিয়েছে চাকরের হাতে। এক টুকরো খেতে খেতে, আস্বাদ নিতে নিতে বীরেন বললো; তুই একটু ব্যানার্জিকে বলিস।

আমি কোনো কমিট করলুম না। জিজ্ঞেস করলুম; তোর ছেলে তো ভারতবর্ষের কিছুই জানবে না, ভারতে এসে করবে কী?

পাইপ টেনে বললো ; ভারতেই আসবে একথা কে বললো ?

—বেশ তো লণ্ডনেই রইলো, বা আমেরিকায়। কিন্তু নিজের দেশ চিনবে না। এখানেও ওর পরিচয় শূন্য, ওখানে ও নিরাশ্রয়।

—ও কি হবে, ওর ওপর নির্ভর করছে।

—কিন্তু বাপ মায়ের ইচ্ছা অনুসারেই তো ও এই অবস্থায় পড়বে।

—মানিয়ে নেবার ক্ষমতার ওপর ওর জীবন নির্ভর করবে।

ভালো লাগছিল না এসব কথা। বললুম ; দেখি কি করতে পারি। আগ বাড়িয়ে কোনো ডিপার্টমেণ্টকে এই সব কথা বলা যায় না। কিন্তু তুই এই মিথ্যে বলে যাচ্ছিস, তাতে তোর কোনো সঙ্কোচ হয় না।

—সঙ্কোচ হবে কেন ? লোকে পুজোয় দেশের এখানে ওখানে বেড়াতে যায়, আমি লণ্ডনে যাই। এতো বেশ ভালোই। পাইপের ধোঁয়া ছাড়লো, আমার যদি লণ্ডনে যাবার প্রভিসন থাকে, তাহলে আমি যাবো না কেন ? আর নিজের স্ত্রীকে দেখতে যাচ্ছি, এতে মিথ্যে কোথায় ? মিথ্যে তো কারো ক্ষতি করছে না।

—পাশপোর্টের তো একটা সংখ্যা আছে। সরকারি কর্মচারী কতবার যাচ্ছে, তারও একটা হিশেব আছে।

—ও আছে সাধারণ লোকের জন্যে। অনেক রাত হলো, আমি যাই। কলকাতায় তোর সঙ্গে আমি দেখা করবো।

বীরেন চলে গেল আরো কয়েকবার ধোঁয়া ছেড়ে। ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় ঢেকে আমাকে চলে গেল বীরেন।

এক মিথ্যে দিয়ে আর এক প্রেমকে সে পেতে চায়। মিথ্যের সত্যিই ওর জীবনের লাভ। ইতিহাসের কোনো সত্য আছে ! যে সত্য বলে, সেই সত্যের সঙ্গে বীরেনের কোনো যোগ নেই, ইতিহাসের যে সত্য ক্রমাগত এগোয় বিরোধের মধ্য দিয়ে, সেই সত্যের সঙ্গে বীরেনের কোনো যোগ নেই ; ওর ব্যক্তিগত লাভে ও মত্ত ; যা পড়ায় তা পড়ায়ই, ক্লাসের বাইরে মনে থাকে না, ক্লাসে বিপ্লবের সত্য বলে, বাইরে ব্যক্তিজীবনে বিপ্লবের বিরোধিতা করে। ভণ্ডামি সর্বস্তরে। মাস্টারিতে ও এলো কেন ? বাবা

এদিক থেকে একেবারে সেকালের। বিশ্ববোধের নীতির যোগ যেন বাবার মধ্যে নাড়ীর মতো, মাঝে মাঝে আমারই কেমন ভয়, বাবার কাছে যেতে সঙ্কোচ বোধ হয়, কিন্তু বীরেন তো একালেরই মাস্টার। মিথ্যা, মিথ্যাই সত্যের রূপে গ ছে আলো ছড়ায়। এই মিথ্যার সত্য থেকে যে ইচ্ছার স্বপ্ন জন্ম নেয়, তার সঙ্গে বাস্তবের কোনো যোগ নেই, যোগ নেই বলেই বীরেন ও সুদেষ্ণা ওদের ছেলেকে নিরাশ্রয় করে তুলেছে। ওদের অ কাঙ্ক্ষা জীবনে অভিশাপ নিয়ে এসেছে ওর। এই অভিশপ্ত জীবনের বিচ্ছিন্নতায় দেশের ছেলেরা নরকের অন্ধকারে জ্বলে আগুনের নিশ্বাসে শুধু ভাসছে, ডুবছে, আর তীরে দাঁড়িয়ে আকাশের নীচে বাপমায়েরা অদ্ভুত কেলি করছে উলঙ্গ হয়ে, আদিম জনকজননীর মতো। বীরেন বড়ো পাইপ টানে, ধোঁয়া ছাড়ে। ওরা প্রেসিডেন্সিতে থাকতেই প্রেম করেছে, এখন ওরা সুখী, বাইরের মিথ্যে ওদের আকর্ষণকে নিবিড় করেছে।

কিন্তু আমি প্রচণ্ড শক্তি চাই, প্রচণ্ড শক্তি ও বীর্য দিয়ে জগৎটাকে উপভোগ করতে চাই, তাকে দু'হাতের মুঠোর মধ্যে পেতে চাই, যদি না পাই, তাহলে তাকে ভেঙে চুরমার করে দেবো। আমার সমস্ত অন্তরাত্মার মধ্যে কর্মপ্রেরণা তীব্রতর হয়ে আছে। সুতরাং, যে-মন্ত্রীর পুত্রই হোক, যতো বড়োই হোক, আমার ধ্যানের অংশে যে শুধু ছিন্নমুণ্ডের মালা ছড়িয়ে দিয়েছে, তপ্ত রক্তের বিষাক্ত হাড়ের হাওয়া বনের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়েছে, তাকে আমি শায়েস্তা করতে চাই। যতোই সে রেঞ্জঅফিসার ফরেস্ট অফিসারকে ধরুক, তাদের সকলকে এক সঙ্গে আমি শাস্তি দেবো। এই শাস্তির মধ্যেই নীতিবোধ জাগ্রত হবে, এই নীতিবোধ যদি জাগ্রত না-ও হয়, তাহলেও আমি আমার প্রতিহিংসা চরিতার্থতার মধ্যে সেই নিবিড় আনন্দকে আমি গভীরভাবে পেতে চাই। যে-বনের স্তব্ধ পরিবেশে সুলতা গোলাপের পাপড়ির মতো আমার সত্তার আলোর ওপর বাতাসে দুলে উঠেছিল, আমার সেই মুক্তির একাত্মতা থেকে শিকারীর বন্দুকের গুলি বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে।

সুলতা কথায় গল্পে ঠাট্টায় মশগুল হয়ে থাকে। কেউ ভাবতেই

পারবে না ওর মনের গুহায় বেদনার অন্ধকার গোপনে নিশীথবাতাস মর্মরিত করে দিচ্ছে। সেই নদীটা শুয়ে আছে। রাত্রি মারাত্মক, আতঙ্কে শিহরিত, ভয়ে কম্পমান। রাত্রি এলেই সারা শরীর আমার দুলে ওঠে। চোখ বুজতে পারি না, সমস্ত গাছপালা অন্ধকার জমাট বেঁধে আমার চোখের সামনে ভেসে ওঠে। আকাশের তারা জ্যোতিষ্ক চাঁদের আলো ছায়াপথ অন্ধকারকে আরো নিবিড় করে তোলে। অন্ধকারের রহস্যকে আতঙ্কিত করে নিবিড়ভাবে, সমস্ত আকাশের দিকে, উন্মুক্ত দিগন্তের দিকে তাকিয়ে আমার মন ভয়ে শিউরে ওঠে, যাকে জানতে চাই, বুঝতে চাই, তাকে বুঝতে পারি না, ধরতে পারি না, মুঠোর মধ্যে আনতে পারি না। কোথায় হারিয়ে যায়, শব্দ প্রচণ্ড ধ্বনি হয়ে আমাকে তাড়না করতে থাকে, তারকাখচিতদিগন্ত-আকাশে আমার শক্তি শূন্যতায় গিয়ে পৌঁছয়, সমস্ত স্তব্ধতার মধ্যে আমার সত্তা হারিয়ে যায়, কিন্তু এক হতে পারি না, তাই ভয়ের আকৃতি আমাকে মারতে থাকে, আমার শরীর আমার কাছ থেকে সরে যায়, অন্ধকারে মিশে যায়, এমন বিলোপসাধনকারী অন্ধকারে মৃত্যু ছাড়া আর কিছু আমার মনের মধ্যে আসে না। আমি যদি মিলিয়ে যেতে পারতুম, আমি যদি এক হয়ে যেতে পারতুম, তাহলে নীরব ধ্যানের অন্ধকারে আমার মুক্তি হতো। দিনের পরেই রাত্রির এই বীভৎসতা আমাকে মারতে থাকে, আমার আত্মাকে নগ্ন করে দেয়। সত্তাকে হারাবার ভয়ে কিছু আঁকড়ে ধরতে গিয়ে দেখি আমি সব হারিয়ে বসে আছি। সুলতা সেখানে রাত্রির মতোই আমার সত্তাকে নগ্ন তুচ্ছ করে, আতঙ্কিত করে তোলে, ওর মধ্যেই রাত্রির সমস্ত উপাদান জড়িয়ে থাকে, ওকে ধরতে গেলেই তারকাখচিত আকাশের মতো শরীরটা দুলে ওঠে, এবং তার মধ্যে আমার শরীর অস্পষ্ট হয়ে যায়।

মাঝে-মাঝে মনে হয়, আমি কী চাই, আমি নিজেও জানি না। তা না হলে সুলতাকে আমি পাই না কেন? ওকে পাবার পথে বাধা কোথায়? বাইরে আঁকড়ে ধরতে চাই, অথচ ঘরের মাটিতে পা নেই। রাত্রি আসতেই সুলতাকে নিয়ে চাকরিস্থলে চলে এলুম। সুলতা প্রথমে

আপত্তি করেছিল, মা আপত্তি জানিয়েছিলেন। কিন্তু সুলতাকে আমার দরকার। সেই জন্যেই জোর করে ওকে নিয়ে এলুম। আসবার সময় আমার ছোট ভগিনীপতির সঙ্গে দেখা, বললেন; জোর করে কিছু গ্রহণ করা যায় না। যা আসে তাই ভালো। গাছ যদি ফল দেয়, তাহলেই আমার অধিকার মাটি থেকে তাকে কুড়িয়ে খাওয়ার, না হলে জোর করে টানলে বিপদ। প্রেম যদি আসে, চলতে চলতে কারু হাসি যদি আমার গোপন অন্ধকার পথকে দুলিয়ে দেয়, তাহলে সেখানেই মুক্তি। তুমি এই রাত্রে জোর করে সুলতাকে নিয়ে কোথায় যাচ্ছ! আজ থাকো, কাল যাবে। সুলতাকে ফলের মতো মুঠোয় ধরো না, ও মানুষ, তাকে ধরা যায় না, অচেনা থেকেই যায়।

না, আমার থাকবার উপায় নেই। আর আমি কর্মে বিশ্বাসী। এতো বিনম্রভাব, হয়তো রবিঠাকুরীয়, আমার চিত্তে নেই। রাত্রি আসামাত্রই আমার মনের মধ্যে মরা নদীর কান্নার স্রোত জেগে উঠলো, তাকে আমি দেখতে চাই, বুকে নিয়ে তার হৃদস্পন্দন অনুভব করতে চাই। বালির বুকে ঢুকে গিয়ে তার শ্বাস কেমনভাবে বয় দেখতে চাই। এবং চাঁদের আলোর রহস্য অন্ধকারে বনের গভীরে যে বেদনার জোনাকির আলো নীলের তন্ময়তা জাগিয়ে ধক্ ধক্ করে, তাকে পাবার জন্যে সমগ্র অন্তরাত্মা কেঁদে উঠলো। একদিকে নদীর চলন্ত স্তব্ধ চলার দিকে আমার আগ্রহ, অন্যদিকে বনের আদিমতায় আমার নিবিড়তা, কান্না। যাকে হারিয়েছি তাকে পাবার জন্যে তীব্র আকাঙ্ক্ষা।

আজকাল একা থাকলে কেন জানি প্রায়ই আমার এক ন্যাকা স্ত্রীজাতীয় বন্ধুর দাঁত-খোলা চিবুনো উচ্চারণ মনে পড়ে। বৈষ্ণব কবিতা বোঝাতে গিয়ে বলতো, প্রদ্যুম্ন বোঝো; শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা কীদৃশো বানয়ৈবাস্বাদ্যো যেনাদ্ভুত-মধুরিমা কীদৃশো বা মদীয়ঃ সৌখ্যঞ্চাস্যা মদনুভবতঃ কীদৃশং বেতি লোভাৎ....এর অর্থ আমি তখন বুঝতুম না। বুঝলেও উপলব্ধি করতে পারতুম না। কিন্তু আমার জীবনে যে এমন ঘটনা ঘটবে ভাবতেও কেমন লাগে। পাপবোধে লিপ্ত সুলতার হৃদয়ের

অভ্যন্তরে ছায়াচ্ছন্ন মদির অন্ধকারে আমি প্রবেশ করতে পারি নি, সেখানকার দীর্ঘ নিশ্বাস আমাকে আকুল করে দেয়, সুলতার অন্তরে বাসুদেবের প্রেমের বাসনার রঙিন আলো কেমন করে দোলে, তার সেই আস্বাদ্য প্রেম কেমন মাধুর্য সঞ্চার করে, এই প্রেমে সুলতার অন্তরের সুখের স্বরূপ জানবার জন্যে আমার অন্তরাত্মা কেঁদে ওঠে, আমার সম্বন্ধে ওর রক্তের বনে কিসের নদী বয়ে যায়। সুলতার হাতের পায়ের নখ, নাভি, রোমকূপ, জরায়ু, দুটি স্তনের কালো বৃন্ত, ঠোঁটের আর্দ্র রক্তিম কুঞ্চন, গালের পাউডার-স্নো-মেশানো শাদা আলোর আভা, চুলের অন্ধকার অরণ্যের ভেতরে কয়েকটি শাদা অংশের ভেতরে কিসের ধ্বনিগন্ধমোহ-বেদনা-জ্বালা-ইচ্ছা-সুখ-আনন্দ-ঈর্ষাঘৃণা কেমনভাবে লুকিয়ে নিভৃতে আছে, সুলতা হয়ে আমার জানতে ইচ্ছে করে। কৃষ্ণকে যদি ভগবান বলে স্বীকার করে নিই, সে-ও প্রেমের মিলনের মধ্যে রাধাকে পরিপূর্ণ জানতে পারে নি, তাই তার অদ্ভুত ইচ্ছা জেগেছিল রাধা হবার জন্যে। বিভেদ হলে রহস্য থেকেই যায়, আমার মধ্যেও আছে। আমি জানতে চাই।

আমি যেখানে আছি, তার পরেই বিস্তৃত খোলা মাঠ, জনশূন্য প্রান্তর, নদীর ভাঙা তীর, আমার ঘরের চারপাশে বাগানের সমারোহ, বিভিন্ন ঝোপ-ঝাড়ওয়ালা গাছ শূন্যতাকে ভরে আছে, চারিদিকে বাগান, নানাজাতীয় ফুল, তার মধ্যে ইটের খাঁজ-করা পথ, দোতলা থেকে একটা বন বলে কখনো মনে হয়, দূরে গাছগুলির মাথার ওপরে যেন ঢেউ খেলে যাচ্ছে, সুলতা যখন এর মধ্যে দাঁড়ায়, তখন সুলতা হারিয়ে মিশে যায়, ওর গায়ের শাড়ি মাঝে-মাঝে চমক লাগিয়ে দেয়, কিন্তু ওর শরীর দেখতে পাওয়া যায় না। সুলতাকে এর মধ্যে হারিয়ে ফেলতে কেমন মজা আমাকে পেয়ে বসে। সুলতাও মুক্তি পায়। কিন্তু এই মুক্তির পথেই বাসুদেব ওর চিত্তে আসন পাতে, অন্ধকার হাওয়ায় তার নিশান ওড়ে। ও যখন বিচিত্র কাপড় পরে ঘুরে বেড়ায়, ওর গায়ের সঙ্গে কাপড় মিতালি পাতায়, ওর দেহের গন্ধে রঙের গন্ধ এক হয়ে যায়, শুভ্র নিটোল বন্ধুর দেহে রঙের উন্মাদ উল্লাস জাগে, তখন আমি মৃত্যু কামনা করি,

যে মৃত্যুর মধ্যে সব মৃত্যু বাসা বাঁধে, সব কিছুকে পাওয়া যায়। এ অনুভূতির কথা সুলতাকে বলতে পারি না। প্রথমতো বুঝবে না, দ্বিতীয়ত এমন হেসে উঠবে, তখন আমার মনের মিথ্ কোথায় হারিয়ে যাবে। যে মিথ্ ওকে কেন্দ্র করে গড়ে তুলেছি, তা ভাঙতে চাই না। সকলেই আমরা মিথের পেছনে চলেছি, তাকেই সাজিয়ে গুছিয়ে সুন্দর করে তুলছি। সুলতার মনের মধ্যেও বাসুদেবের মিথ্ সাজানো। এমনি করে প্রত্যেকেই আমরা একটি স্বতন্ত্র জগৎ, প্রেমে এই জগতে আনাগোনা চলে, কিন্তু জানা যায় না।

দুদিন বাদে বললুম; চলো, রাত্রে নদীর ধারে ঘুরে আসি। সুলতা না করলো না, দুজনে নদীর ধারে হেঁটে সময় কাটালুম। ওপারে বনের দিকে দৃষ্টি পড়তেই সুলতা বলে উঠলো, দেখছো, বনটা কেমন ভয় দেখাচ্ছে। হেসে বললুম; ওই বনেই তো তোমাকে নিয়ে আবার ডুবতে চাই।

স্যাঁতসেঁতে দেওয়াল থেকে চুন-সুরকি খসে যাচ্ছে, দিন দুপুরেই জল ঝরছে, লম্বা লম্বা উঁচু দেওয়াল, হলের মধ্যে বিরাট ঘরে বসে একা কাজ করতে হয়। লোকজন যখন আসে ভালই লাগে, কিন্তু একা আপন মনে কাজ করতে গেলেই পুরনো চুন-সুরকি খসে-পড়া দেয়ালগুলি আমাকে কি রকম চেপে মারতে আসে। মনে পড়ে, শীতের শুষ্ক দুপুরে প্রশান্ত রৌদ্রের মহিমায় টলটল জলের শরীর শীর্ণ হয়ে মরার আগে অদ্ভুত হাসছে।

একদিন দুপুরে হন্তদন্ত হয়ে এক ভদ্রলোক প্রবেশ করলো, বিনীত প্রার্থনায় ফষ্টিনষ্টি করবার পর বললো; স্যার, আপনি যদি শিকারের ব্যাপারটা ছেড়ে দেন।

প্রথমে কোনো আমল দিই নি। পরে বললুম; আপনি কে, আপনি এ কথা বলতে এসেছেন কেন?

হেসে বললো; আমি স্যার পার্টিরই একজন কর্মী।

থামিয়ে দিয়ে বললুম; এটাতো সরকারের ব্যাপার, আইনকানুন

ঠিক রাখতে হয়। সুতরাং পার্টির এক্তিয়ারের বাইরে, এটা আমার হাতে ছেড়ে দিন।

কাঁচুমাচু হয়ে বললো; তাতো ঠিকই, তবে মানী লোকের ছেলে, একটা দোষ করে ফেলেছে।

—মানী লোকের ছেলে দোষ করলে পার্টির তরফ থেকে মুক্তি পায়, তাই না।

—না, তবে স্যার একটু ভেবে দেখলে ভালো হতো। পার্টিই তো সরকার চালায়।

—কেন, পার্টি থেকে মুভ করবেন তাহলে!

সেই সময়েই রেঞ্জঅফিসার ও ফরেস্ট অফিসার ঢুকলো। পার্টির লোকটিকে দেখে সাহস সঞ্চয় করে বললো; স্যার, সত্যি কাজটা খুব খারাপ হয়ে গেছে। তবে ভদ্রলোক একবার—।

থামিয়ে দিয়ে বললুম; তবে আপনি বদলি হন, কারণ আপনার দ্বারা কাজ ঠিক মতো হচ্ছে না। এবং আইনকানুন মানতেও আপনি রাজি নন।

ফরেস্ট অফিসার বিগলিত ভঙ্গিতে বললো; না স্যার, দোষটা আমাদেরই, আমরা ঠিক মতো সাবধান করতে পারি নি।

বললুম; ও, বেশ তো, তবে আমার জানা রইল। আচ্ছা, আজকে এই পর্যন্ত। আমার হাতে যা আছে তা করবো। আর কিছু বলার আছে?

সারা শহরে গুজব রটে গেল আমার চাকরি যাচ্ছে। কারণ মন্ত্রীর ছেলেকে আমি শিকারের অন্যায় অজুহাতেও ধরতে পারি না। জেলশাসকের থেকেও মন্ত্রীর দাপট অনেক বেশি! কারণ মন্ত্রীরাই আইনকানুন করে। তাদের ইচ্ছেতেই আমাদের বাঁচামরা, আমরা ভৃত্য মাত্র।

এতে আমার কিছু আসে যায় না। আমি জানি, চাকরি থাকলেও বিপদ, না থাকলেও বিপদ, এবং সব বিপদ এক সময় এসে হরণ করে নিয়ে যায়, সুখদুঃখ সকলেরই বিনাশকারী সময়, মৃত্যু আমাদের পরম

গতি, আমরা সেদিকেই যাচ্ছি।

জন্ম আমাদের হাতে নেই, কিন্তু জন্মের পর থেকেই আমরা মৃত্যুর মধ্যে বাস করছি, স্নান করে উঠছি, তারপর একেবারে মৃত্যুর গভীরে ডুবে যাই ; মৃত্যুর চেতনা আমাদের বেঁচে থাকার ও কর্মের চেতনতা। যে লোক মৃত্যু সম্বন্ধে ভাবে না, জানে না, সে বেঁচে নেই। সুতরাং কে কি বললো, তা নিয়ে আমার মাথাব্যথা নেই, আমার হাতে যেটুকু শক্তি আছে, যে শক্তিতে সুলতাকে আমি পাইনে, তাকে আমি কাজে লাগাবো। যদিও হাসি পায়, তবু মাঝে মাঝে প্রতিধ্বনির মতো কর্মে মুক্তির কথা মনে পড়ে। আসলে আমার জীবনে এসব কিছু নয়, আমার শক্তিকে আমি চালিত করতে পারছি না, আমি-যে আমি এটাকে আমি উপলব্ধি করতে পারি না, ছোটবেলা সাঁতার কাটতে গিয়ে গঙ্গার জলের ঢেউয়ের ওপর নিজেকে হারিয়ে নিজেকে উপলব্ধি করেছি, সবুজ হাওয়ার আলোর বনে তাপহীন আগুনে বসে যে বিস্মৃতি আমার সত্তার গভীরে লুকিয়ে আছে, তাকে আমি সুলতার আলিঙ্গনে শুধু পেতে চাই, সুলতাকে পেতে গিয়ে যে বাধা, যে অন্তরায়, সেই শক্তিই আমাকে কর্মে পাগল করে তুলেছে, নারীর কাছে পুরুষ অনেকটা আধ ন্যাংটো ভোলা মহাদেবের শুয়ে থাকবার মতো, চঞ্চল লীলা দেখা ছাড়া পুরুষের কোনো উপায় নেই, অন্য কিছু চলছে, কাজ হচ্ছে, অগ্রগতি হচ্ছে না, মানুষ মরছে, কোথায় কি হচ্ছে, এ জানার কোনো উৎসাহ কৌতূহল নেই, কারণ সৃষ্টির মধ্যে ভালোমন্দ জন্মমৃত্যু একসঙ্গে জড়িয়ে আছে, তুমি থাকলেও আছে, না থাকলেও আছে, আমিও এ সৃষ্টির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত, আমার একার মৃত্যু বা জন্ম বিরাটকালের সৃষ্টির সমুদ্রে কিছু নয়, আমি তাই শান্তি চাই, সুখ চাই, যা আমাকে আমার সত্তাকে গভীরভাবে বুঁদ করে দিতে পারে, আমার বন্ধু সুমথ যেমন রয়েছে, তার ওপর তার স্ত্রী লীলা করে যাচ্ছে, সে লীলায় সুমথ সঙ্গী নয়, দর্শক, দর্শক হতে হতে একেবারে আত্মহারা হয়ে যায়, তখন আপিশে নানারকম ঝামেলা চলে, ওপরওয়ালার বকুনিঝকুনি আসে, সুমথের

তাতে হুঁশ নেই, কারণ সৃষ্টির লীলায় সে একাত্ম। আমার কাছে এসে বারবারই মুখ টিপে হাসে, ওর মুখটেপা হাসি আমাকে জ্বালা ধরায়, তাতে ওর কিছু আসে যায় না, ও জানে ওর মধ্যে পরম শান্তি বিরাজ করছে। আমি সুলতাকে পেয়ে সুলতার রক্তের অন্ধকারে অন্ধকার হাওয়ার মতো মিশে চুপটি করে ঘুমোতে চাই, ওর দুই বুকের চন্দ্রতারায়, গর্ভের কুটিল অরণ্যে চলতে চাই, ওর চলার সঙ্গে আমার চলার ছন্দ হারিয়ে দিতে চাই। ওর সমস্ত দেহটার মধ্যে নদীর তরঙ্গে বনের উন্মাদনায় নাম-না-জানা পাখির আনন্দে বিভোর হতে চাই। হায়রে বাসুদেব, বাসুদেব, কিন্তু বাসুদেব একটা ক্লীব, জড়। আর সুলতা ত্রিগুণাত্মিকা শক্তির মতো আমার সঙ্গে বিভেদ সৃষ্টি করে চলেছে। কিন্তু সুলতার মধ্যে আমার সেই শক্তি বিভেদ সৃষ্টি করে না, ষড়ৈশ্বর্যে সৃষ্টির আনন্দে ভরপুর, তাতে আমার উপাদানও মিলে মিশে একাকার হয়ে যায়। সুলতা, তুমি কোথায়, তোমার আত্মার গভীরে গানের সুরে কার বেদনা নীল আগুন জ্বালাচ্ছে? নাঃ, তাই আমাকে কর্ম করতে হয়, ভুলে থাকতে হয়, মানুষ বিস্মৃতি চায়; গান, সাহিত্য, ধর্ম, দর্শন, একটা ফ্যান্টম তৈরি করে ভুলে থাকতে চায়, সে যদি সব বিষয়ে জানতে চায়, সজাগ থাকে, তার মৃত্যু অবধারিত, আমি সুলতাকে হারিয়ে সচেতন জেগে থাকার সব উপাদান পেয়েছি, তাই আমার প্রচণ্ড শক্তি, ঐশ্বর্য বীর্য, লোকে আমাকে ভয় করে, পূজা করে। সিনেমা ঘরে পাখা নেই, গোপনে দেখে ভয় দেখিয়ে একদিনে পাখা করে দিয়েছি, টেম্পো যাত্রীদের নিয়ে বস্তাপচা করে অত্যাচার করে, হারুন-অল্ রশিদ সেজে শায়েস্তা করেছি; মদের ভিড়ে জোড়া হাঁটু সন্ধ্যার আবছা আলোয় কীর্তন শুরু করতো রাস্তায় মেয়ে দেখলে, এস. পি. লাগিয়ে একদিনে ঠাণ্ডা করেছি, সাপের নাচে গর্তের ভীষণতা জাগাতো পুজোর বিসর্জনে, দুদিনে শেষ করে দিলুম, ট্রেজারি আপিসে কাজ হতো না, ঠিক মতো আসতো না, ফাইল চাইলে বলতো হারিয়ে গেছে, এক সার্কুলার দিয়ে ঠাণ্ডা করে দিলুম; সীমান্তে চোরাই কারবারি হতো, সুলতাকে না পেয়ে রাত্রে গিয়ে

সকলকে ধরে জেলে পুরে দিলুম। নীরব আলস্যের শান্তির মধ্যে এতো সজাগ দৃষ্টি আমার অধীন কর্মচারীরা ভালো চোখে দেখে না, পুলিশরাও চটে গেল, পয়সা নেই এক কড়ি, অর্থাৎ খাটুনি শতগুণ। এ আমাদের জাতির রক্তে নেই, তাই চারদিকে আমি শত্রু তৈরি করেছি, বৃষ্টির দিনে বালির ঝড়ে খালি গায়ে সমুদ্রের ধারে দাঁড়ালে যেমন সারা গায়ে বালি লেগে কিচ্‌কিচ্‌ করে, তেমনি এদের বিরোধিতায় আমার শরীর কিচ্‌কিচ্‌ করতে লাগল। এই সময় হঠাৎ একটা সংবাদ পাওয়া গেল, বাচ্চাদের জন্যে বিনে পয়সায় মার্কিনী দুধ একজন চুরি করে বিরাট পয়সা কামিয়েছে, বাড়িগাড়ি করেছে, সূত্রটা স্ত্রীর দিক থেকে, কোনো একটা কল্যাণ সংস্থায় সহ-সভাপতি থেকে অদ্ভুত ভাবে সট্‌কে দিয়েছে। লোকটি একটি পার্টির স্থানীয় নেতা, ওর স্ত্রী শিক্ষিকা। এতো সুখ পার্টির অন্য লোকেরা সইবে কেন? ওর বিরোধীরা একদিন আমাকে এভিডেন্স এনে দিয়ে বললো; স্যার, আপনার মত এমন নীতিপরায়ণ লোক নেই, এর সুবিচার চাই।

সুবিচার! কিন্তু আমাকে তো কাজ করতে হবে, জোনাকির আলোর চেয়ে মশালের প্রখর আলো মাঝে মাঝে কামনা করি, তাই ধরিয়ে দিলুম, এতে একদল আমাকে সমর্থন করলো, অন্য দল শিকারী ছেলের মন্ত্রীর দলে ভিড়ে আমাকে শায়েস্তা করতে প্রস্তুত হলো। এই প্রস্তুতিতে আমিও চ্যালেঞ্জ নিলুম। কিন্তু দুধচুরির লোকটার মুখেচোখে অপরাধ করেও যেন কেমন পরম তৃপ্তি, সে কি, সে কি ভাবছে জেল দাও আর যাই করো টাকা তো পেয়েছি! নাকি, তাদের এই দ্বৈত কর্ম প্রচেষ্টায় শান্তি, সেখানে ওরা দুজনে দুজনের সঙ্গী, ভালোমন্দ সব জড়িয়ে আছে। ওদের ওই দ্বৈত সত্তাকে আলাদা করা যায় না।

যদিও আমার বিরুদ্ধে নানা মতবাদ সক্রিয়, অনেক শত্রু সমবেত, তথাপি জোর করে সব কিছু অস্বীকার করে মন্ত্রীর পুত্রকে তিন মাসের শাস্তি দিলুম, মন্ত্রীর বিরুদ্ধবাদীরা আমাকে ধন্য ধন্য করলো, বললো; এমন সাহস এ যুগে দেখা যায় না। এমন লোক যদি বাংলাদেশে আরো

থাকতো—।

শত্রু-পক্ষরা বললো ; আচ্ছা দেখা যাবে কতোদিন ওদের দলে ভিড়ে থাকতে পারো, পার্টির ওই নেতাদের হয়ে করছো, ওই নেতাই বা কতোদিন থাকতে পারে পার্টি'র মধ্যে দেখি।

আমি কাজ করি না, এ কাজের মধ্যে আমার অহংকার নেই, আমি ভুলতে চাই, কাজটা আমার ভুলে যাওয়ার জন্যে। বাবা যখন রেগে যেতেন, পঙ্গু শরীর নিয়ে কাঁপতে কাঁপতে বলতেন ; কাজ কর, কাজ কর। গীতা আউড়ে বলতেন ; ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্মকৃৎ কার্যতে হ্যবশঃ কর্ম সর্বঃ প্রকৃতিজৈগু'ণৈঃ। নিয়তং কুরু কর্ম ত্বং কর্ম জ্যায়ো হ্যকর্মণঃ শরীরযাত্রাপি চ তেন প্রসিধ্যেদকর্মণঃ। সুতরাং বাবার কথা মতো আমি কাজ করে যাচ্ছি, এ কাজের মধ্যে আমি নেই, তাই বলে ভগবানও নেই, আছে প্রকৃতি, যার মধ্যে আমার শরীরের উপাদান কাজ করছে, আমার রোধক্রোধমোহ সর্বোচ্চ স্থান পাচ্ছে। এই মোহ কি জরায়ু যেমন গর্ভকে আচ্ছাদিত করে, তেমনি আমার বিশুদ্ধ ইচ্ছাকে প্রাপ্তিকে আচ্ছাদিত করছে ? নিশ্চয় কিছু আচ্ছাদিত করছে, কিন্তু কি সে বস্তু আমি জানি না। এই কার্যের মধ্যে আমি নেই, ঈশ্বর নেই, শুধু আমি জ্বলতে চাই, কারণ ভুলতে চাই, যদি জ্বলনটা মোহের আবরণ হয়, তাহলে এটা মোহ সৃষ্টি করছে। সুলতা, সুলতাই আমার কাছে ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি, আমার শরীরে কামে ক্রোধে জ্বালায় ঐশ্বর্যকে সে চেতিয়ে দিচ্ছে, কিন্তু আমি চেয়েছিলাম সুলতার মধ্যে মিশে যেতে। তাই আমার কর্মের মধ্যে আমার ইচ্ছার প্রাপ্তি নেই, শান্তি নেই, আছে শুধু শরীরের যন্ত্রণা, যা শুধু সুলতাই দিচ্ছে। শান্তি দিয়ে আমি প্রতিহিংসা নিলুম, আদিম বনের রহস্যে সুলতার সঙ্গে আমার বিচ্ছেদ ঘটিয়েছে গুলির শব্দে। বিচ্ছেদ, বিচ্ছেদ !

এই যন্ত্রণাময় কাজের মধ্যে আমার মন ও বুদ্ধি প্রচণ্ডভাবে উত্তপ্ত হয়েছে, যতোবারই সুলতার কাছে গেছি, সুলতাকে মারাত্মকভাবে পীড়ন করেছি, যখন ধরতে গেছি, তখন শরতের দীপ্ত আলোয় প্রজাপতির

পাখায় আনন্দের চঞ্চলতাকে স্তব্ধ করে দিয়েছি, ওর মনের গোপন অন্ধকারে নিস্তব্ধ দোলনচাঁপার কাঁপনকে থামিয়ে দিয়ে মুচড়ে দলিয়ে জঘন্য গন্ধ ও রস বার করেছি, শিউলি গাছের ঝোপের ভেতরে দুপুরে রঙিন পাখি আপন মনে এডালে-ওডালে ঘুরে বেড়ায় যেমন, তেমনিভাবে হয়তো সুলতা ঘুরছিল, আমি প্রচণ্ড শব্দে ওকে থামিয়ে দিয়েছি, শালিখের ডানার ভেতরের রঙিন রূপ বার করে ডান হাত তুলে ধরে মুখের কাছে নিয়ে অসহ্য বেদনায় দূরে ছুঁড়ে দিয়েছি। জলের ধারে ছোট গাছের শিকড়ে বিকেলের বাতাসের ধ্বনিকে আমি ধরতে চেয়েছি, পাইনি ; বরং দেখেছি শীর্ণ নদী বালির গভীরে মুখ ঢুকিয়ে গলা শুকিয়ে কাঁদছে, তার কান্নার ধ্বনি জলের ওপরে, গভীরে, অতলে, দূরান্তে বনের অভ্যন্তরে। আমার এই প্রচণ্ড কর্মের মধ্যে সুলতা কেমন স্তব্ধ নিস্তব্ধ, ম্লান, আমার দেহের চারধারে ওকে লতার মতো পেঁচিয়ে ধরতে চেয়েছি, ও শুকনো লতার মতো মাটিতে নেতিয়ে লুটিয়ে পড়েছে। ওকে মাঝে-মাঝে আমার পাঁচ পাপড়িযুক্ত শাদা শিউলির মতো মনে হয়, শিউলির হলুদ বোঁটার গভীরে কেশরের পরাগে শাদা আলোর আভায় হলুদ রহস্যের অন্ধকার মনের মধ্যে মিশে আছে, বাইরে শাদা রূপের শ্বেত গন্ধ ছড়িয়ে দেয়। শরতের সকালে রৌদ্রে কুয়াশায় যেন সারা দিগন্ত আচ্ছন্ন হয়ে আছে, শুধু একটা রহস্যের কালো ছোপের মতো কুয়াশার ভেতরে গাছপালা আবছা হয়ে দেখা যাচ্ছে। সুলতাও সমস্ত কিছু লুকিয়ে রেখে রহস্যের শাদা কুয়াশা আলোর মধ্যে ছড়িয়ে দিয়েছে, ওর ভেতরে কিছু দেখা যাচ্ছে না। এখন আর আগের মতো ঝগড়া করে না, তীব্র বোধে আমাকে ঝটকা মেরে তাড়িয়ে দেয় না, ঘরদোর বন্ধ করে জিনিসপত্র ভাঙে না, সময়ে-অসময়ে ঘরের বাইরে বেরিয়ে গিয়ে খাঁ-খাঁ দুপুরে বসে রৌদ্রের সঙ্গে মিতালি পাতায় না। সমস্ত কিছু গ্রহণ করে ম্লান হয়ে যায়, ওর ম্লান শরীরে নিরাসক্ত ঘৃণার আগুন জ্বলছে, সেখানে আমার শরীর শুধু পুড়ছে, জ্বলছে, ওর হিংস্রতার সঙ্গে লড়াই করা যায়, রাগ ক্রোধকে ক্রোধের আগুনে পুড়িয়ে শুদ্ধ করা যায়, কিন্তু নিস্তেজ

ধ্যানের মধ্যে ওর একটা শান্তির আশ্রয় দেখা দিয়েছে, সেখানে সে একান্ত মনে অপ্রাপ্তির কান্নার মধ্যে সান্ত্বনার গান শুনেছে, সেই গানেই নিজেকে সমর্পণ করেছে, তাই বাইরে কেমন নিস্তেজ ম্লান ধীর শান্ত, কিন্তু ভেতরে গানের তীব্র সুর, আমি সে গান শুনি, কিন্তু ভেতরে প্রবেশ করতে পারি না, মাঝে মাঝে আমার মনে হয়েছে, আমি কী চাই, আমি কী চাই আমি নিজেও জানি না, তাই ক্রোধ। ক্রোধের বদলে তাকে যদি আত্মসমর্পণের মধ্যে পেতুম, না, আত্মসমর্পণ করলেও সুলতার তাতে কিছু আসে যায় না, গায়ে পিঁপড়ে বসলে যেমন ফেলে দিই, তেমনিভাবে আমার সমর্পণকে সে ফেলে দেবে, দিয়েছে, কারণ উন্মুখতা নেই ওর, আমারটা নিয়ে আমি তৃপ্ত থাকতে পারতুম, আমি যে ভালোবাসি এতেই আমার আনন্দ, কিন্তু এই আনন্দে আমার মন সায় দেয় না, কারণ এই আনন্দের মধ্যে আমার ইচ্ছার তৃপ্তি নেই, আমি সমগ্র সত্তা দিয়ে সান্ত্বনার তৃপ্তি চাই, সুলতা আমাকে সেখানেই মেরেছে।

একদিন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার লেলিহান শিখায় রক্তের জল ঢেলে গভীর রাত্রে জিপে চড়ে শীর্ণ নদীর ধার দিয়ে বাড়ি ফিরছি, ঘর দোর অন্ধকার, ঘরে খাটের কাছে গিয়ে দেখি সুলতার অবশ শিথিল বিস্রস্ত শরীরটা শাদা বালিশের ওপর পড়ে অন্ধকারকে ছুঁয়ো দিচ্ছে। চমকে সুইচ টিপে আলো জ্বালতেই সুলতার বুক থেকে গাঢ় তমিস্রা জানালা দিয়ে াইরে মিশে এক হয়ে গেল।

বাসুদেবের আত্মকথা

আমার নিজেরই অবাক লাগে, কেন কেন সুলতার কাছে গিয়েছিলুম। সুলতাকে আমি দেখতে চাই, দেখতে চাওটাও আমার পক্ষে অপরাধ! বিয়ের আগে আমার চারধারে আগুনের পাশে

বাতাসের মতো ঘুরে বেড়িয়েছে, কিন্তু আমার আগুন তাতে বেশি উদ্দীপ্ত হয় নি, দাউ দাউ করে জ্বলে নি। বর্ণ-বৈষম্য ছিল, কিন্তু আমাদের কাছে ভয় কোনো বাধা ছিল না। চাকরি করি বাউণ্ডুলের। আজ আছি এখানে, কাল কোথায়। কথা বলতে আমার ইচ্ছে হয় না, কথা শুনতেও চাই না। বাইরের সব কথা ভেতরে এসে জগৎ তৈরি করে। সুলতাও আমার কাছে জগৎ, ওকে আমি দূর থেকে দেখি, উপভোগ করি, কিন্তু ওর সঙ্গে কখনো একাত্ম হই না, অথবা সুলতা আমার মধ্যে একাত্ম হয়ে যায় না। আমার ভেতরে সুলতাকে দাঁড় করিয়ে ওকে আমি উপভোগ করি। তাই আমি সুলতাকে যতোটা চিনি, যতোটা জানি, এর চেয়ে বেশি কেউ জানে না। এটাও আমার একপ্রকার অহংকার। আমি আমার মতো করেই চিনি, জানি আমি তো সুলতা হয়ে যেতে পারি না, শব্দ যা শুনি, তার সব অর্থ কি আমি জানি যা লোকে ব্যবহার করে। কিছুটা বুঝতে পারি, বাকি সবটাই কোথায় উবে যায়। তবু যতোটা পারি দূর থেকে উপভোগ করি। মা যেমন শিশুকে বুকে জড়িয়ে ধরে আদর করে, তার সঙ্গে সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করে, অথচ একাত্ম হয় না, সুলতাকে আমার মনের মধ্যে এমনিভাবেই উপভোগ করতে চাই একা।

আমরা এক সঙ্গে ইংরেজি অনার্স পড়েছি। সুলতা ভাষার আবেগে ভেসে যেত। এর জন্যে এক মেয়ে-অধ্যাপকের কাছে সুলতা বকুনি খেয়েছে। ও ভাষায় ফুটে উঠতে চায়, ভাষাকে গানে ফুটিয়ে তুলতে চায়। কিন্তু পরীক্ষায় আমি বরাবর ফার্স্ট হতাম। এতে ওর রাগও হতো, আনন্দও হতো। রাগ হতো এই কারণে যে আমাকে কোনোদিন মারতে পারতো না, আনন্দ হতো এই কারণে আমার সঙ্গে ওর সম্পর্ক ছিল।

কবে যে আমার সঙ্গে ওর সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল, সে অনেক দিনের। বৃহৎ দেবদারু গাছটার নীচে ঘাসের ওপর বসেছিল সুলতা, হলুদ পাতা উদাসীন আলস্যে উড়ে পড়ছিল ওর মাথার ওপর। কিছুক্ষণ আগেই বৃষ্টি

হয়ে গেছে, শাদা ফোঁটা মুক্তোর মতো ঝুলছিল পাতায়, আকাশে মেঘের কালো ছায়া সরে নি ; চারদিকে একটা বিষণ্ণতার ছায়া, এই ছায়াতেই অস্পষ্ট দিনের পাপড়ি ফুটেছে রঙের গন্ধে, দেবদারু গাছের পাতায় অরণ্যে অজানা পোকার বিবশ-করা গান, মাথার ওপরে রঙিন পাখি বর্ষার আদ্র'তা নিয়ে কোথায় উড়ে যাচ্ছে, এই বিষণ্ণতার মধ্যে দুঃখ, দুঃখের মধ্যে পূর্ণতা, এই পূর্ণতায় কেমন এক বোধ ব্যাপ্ত হয়ে যায়। এখানে আনন্দ-সুখ-উল্লাস সব একাকার, এগুলি ক্ষণিক, অন্য প্রবল রূপ ধরতে পারে, তবু সব মিলে দুঃখের মধ্যে কেমন একটা বিষণ্ণতা। এমনি এক পরিবেশে সুলতাকে নিয়ে আমি কথা বলেছিলুম, সুলতাকে নিয়ে আমাদেরি ক্লাশের একটি ছেলে পালিয়ে যাবার কুমতলব দিয়েছিল, সুলতা চমকে উঠে আমার কাছে পালিয়ে এসেছে, আমার হাত ধরে দেবদারু গাছের নীচে বসিয়ে দিয়ে চোখ নামিয়ে বলেছিল ; বাসু, তুমি কি এর কোনো ব্যবস্থা করবে না ! ও ইংরেজিতেই কথা বলেছিল। লরেটো থেকে ভালো রেজাল্ট করে এসেছে।

আমি তখনো কোনো কথা বলিনি। কি বলবো, ছেলেটির সাহস হলো কেন? ওর কাছ থেকে কি কোনো ইঙ্গিত পেয়েছে?

সেই প্রথম আমি সুলতার স্পর্শ পেয়েছিলুম। সেই স্পর্শে আমি কোনো চাঞ্চল্য অনুভব করি নি। সুলতার দিকে তাকিয়ে শুধু দেখেছিলুম, ও কী বলতে চায়, ও আমার কাছে কেন আসে। গাছ থেকে জল পড়ছিল ওর মাথায়, দমকা বাতাসে ওর শ্যাম্পু করা চুল উড়ে যাচ্ছিল, দূরে কোথায় যেন শব্দ উঠছিল গানের।

সুলতা রেগে বললো ; বাসু, আমি তোমার কাছে চুপ করে বসে থাকতে আসি নি। বলো, তুমি কী বলবে ?

—আমি মারামারি করতে পারি না শিভাল্‌রি দেখাতে। তোমার অধিকার আছে, ওকে উচিত শাস্তি দেবার। সুতরাং তুমি ফেস্ করো। রেগে সুলতা বলেছিল, তুমি ভীরু, কাপুরুষ।

আমি হেসেছিলাম, সুলতা আরো রেগে গিয়েছিল, আমার কাছ

থেকে দৌড়ে যেতে গিয়ে মাটিতে হোঁচট খেয়ে পড়লো, আকাশ কালো করে ঝেঁপে বৃষ্টি এসেছে আবার। বৃষ্টি আমার ঠোঁটে পড়েছে, ঠোঁটে নুন লেগে কেমন স্বাদ লাগছে, চুল ভিজে গেল আমার, আমি গেট পেরিয়ে বাইরে চলে এলুম বাস ধরবো বলে।

সুলতার বাবা কাস্টমসের বড়ো অফিসার। গাড়ি করে বাড়ি যায়, কলেজে আসে। একদিন জোর করে আমাকে ওদের বাড়ি নিয়ে গেল। বাড়িতে ঢুকতেই এক বৃদ্ধকে দেখতে পেলুম। সুলতা তার সঙ্গে আমাকে পরিচয় করিয়ে দিতে চাইলো, চোখ তুলে তাকালো একবার। কিন্তু কোনো ভ্রূক্ষেপ করলো না। মামি বলে সুলতা ভেতরে গেল। ওর মাকে জোর করে বাইরের ঘরে নিয়ে গেল সে। দেখতে সুন্দর, একটু মোটা, বাঁ পাশে সিঁথি, স্লিভলেস ব্লাউজ পরনে, বগলের রোম কামানো, মুখে পানের ছোপ, শাড়ি শরীরে, হেসে বসতে বললো আমাকে, আমি হাসি দিয়েই উত্তর দিলুম। কথা বললুম না। সুলতা আমার সম্বন্ধে অনেক কথা উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে যেতে লাগলো ইংরেজিতে; জানো মা, ওকে কিছুতেই পরীক্ষায় হারাতে পারি না। অথচ তুমি তো জানো, ওর চেয়ে কতো বেশি আমি পড়ি। মাঝে-মাঝে মনে হয় আমাদের প্রফেসাররা ওর ওপর পার্শিলিয়াটি করে।

আমি কথা শুনে হাসছিলুম।আমার ওপর রাগ গেছে ওর।

বৃদ্ধ ভদ্রলোক একাকী আপন মনে আকাশ দেখছিল, মাথার চুল পেকে গেছে, বয়স সত্তরের কাছে, সৌম্যদর্শন। সুলতা একবার দাদুভাই বলে সম্বোধন করলো, বৃদ্ধ শুনতে পেল কিনা বোঝা গেল না। সুলতার মা বুঝতে পারলো একটা অসৌজন্য ঘটছে বৃদ্ধের দিক থেকে। কৈফিয়তের সুরে বললো; বয়েস হয়েছে, কথা বলতে চান না, বিয়ে করেন নি। সারা জীবন পুলিশের চাকরি করেছেন দাপটে। আজ শুধু আপন মনে থাকেন একা। সুলতার সঙ্গে ভারি ভাব ওঁর। বাংলা তো ওর কাছ থেকেই সুলতা শিখেছে।

কেমন একটা কৌতুক বোধ হলো আমার, হাসি পেল, এই কারণেই

কি সুলতা বাংলা লিখতে পারে না। বৃদ্ধ একবার আবার আমাদের দিকে তাকালো, তারপর ভেতরে চলে গেল। ওর নিস্তব্ধতা ওর চঞ্চলতারই একটা প্রকাশ। একা যেন আর থাকতে পারছে না, সঙ্গী চাইচে। কিন্তু সঙ্গী নেই, কর্ম থেকে মুক্তি পেয়ে সঙ্গী হারিয়েছে।

সুলতার ছোট বোন আমাকে দেখছিল আর মুখ টিপে হাসছিল লুকিয়ে। ইঙ্গিতে ডাকলুম, এলো না।

সুলতার বাবা এলো সন্ধ্যা উত্তীর্ণ করে। সুলতার মা আমাকে পরিচয় করিয়ে দিলো। ভদ্রলোক একেবারেই নিরীহ। সংসার চালায় সুলতার মা। পরামর্শ করে সুলতার দাদুর সঙ্গে। সুলতার বাবার মামা।

সুলতারা যে পাড়ায় থাকে, সেটা বাঙালি পাড়া নয়। বেক বাগান এরিয়ায়। খৃশ্চান, মুসলমান, হিন্দু, বাঙালি পাঞ্জাবি হিন্দুস্তানি মাড়োয়ারি সব এক হয়ে থাকে। কোনো বাড়ি থেকে রবীন্দ্রসংগীত, কারো বাড়ি থেকে বারের নাচের ধ্বনি, কারো বাড়ি থেকে জাজসংগীত বাজছে গ্রামোফোনে, পাড়াটা নিস্তব্ধ, কোনো গণ্ডগোল নেই, রকে আড্ডা নেই, প্রত্যেক বাড়িতেই একটু গানের সমারোহ আছে, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে।

সুলতার বাবা আমাকে দেখে কি মনে করলো আমি বুঝতে পারলুম না। আমার বেশবাসে চমক নেই, চাকচিক্য নেই, চেহারায় জৌলুশ নেই, আমি শুধু ভালো ছাত্র। আমি সমস্ত ব্যাপারটা দূর থেকে কৌতুক বোধ করলুম। রাত্রের খাওয়া ওখানেই খেলুম সেদিন। ওদের ড্রাইভার আমাকে বাড়ি পৌঁছে দিল।

বাড়িতে ফিরতেই মা জিগ্যেস করলো; কোথায় গিয়েছিলি বাসু? তোর জন্যে তোর বাবা বসে বসে পরে খেয়ে নিলো।

—আজকে আর আমি খাবো না।

—সুলতার বাড়ি গিয়েছিলি!

একটু বিস্মিত গলায় বলি; তুমি কি করে জানলে?

—কেন বাসু, জানাটা কি আমার অন্যায় হয়েছে? মা অভিযোগ করলো।

—না অন্যায় কেন? তবে তোমাকে তো আমি বলেছি।

—তার জন্যেই তো আমি অবাক হচ্ছি বাসু? তোর বন্ধু অনিরুদ্ধ এসেছিল। সেই বললো, সে নাকি সুলতাকে খুব ভালোবাসে।

—বেশতো মা, অনিরুদ্ধ সুলতাকে ভালোবাসে তাতে আমার কি? আমি তো তাকে বাধা দিইনি, সুলতাকেও নিষেধ করিনি।

—তাহলে সুলতার বাড়ি তুই গেলি?

—কেউ যেতে বললে কি না বলবো!

—তুই সুলতাকে ভালোবাসিস না?

—মা, তুমি জানো আমি পড়ছি।

—তাহলে মিশিস কেন?

—মিশলে কি তোমার ভয় আমি চলে যাবো?

—না, ভয় নয়, আমি জানতে চাই তোর মনকে।

—আমি তোমায় বলছি, সুলতাকে আমার দেখতে ভালো লাগে, যেমন অন্যদেরও দেখতে ভালো লাগে। সুলতা মিশতে চায়, তাই মিশি, অন্যেরা চায় না, তাই যাই না। ওর প্রতি আমার কোনো আকর্ষণ নেই, আবার বিরাগও নেই।

মা চিৎকার করে বললো; বাসু, তুই যাতে ফার্স্ট হতে না পারিস তার জন্যেই সুলতা তোকে ভোলাচ্ছে।

আমি শান্ত স্বরে বললুম; তাতেও তোমার ভয় নেই মা, আমি ফার্স্ট হবোই।

বাবা মা'র দিকে তাকিয়ে অবাক হলো, কোনো কথা না বলে ভেতরে চলে গেল, বছর দুই আছে বাবার চাকরির। মার্চেন্ট আপিশের অ্যাকাউটান্ট। বাবার ইচ্ছে আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর হই। মা চায় আমি আরো বড়ো হই। আমাদের টাকা বেশি নেই, কিন্তু অভাবও নেই।

এমনি দেখতে দেখতে বছর কেটে গেল, কখন আরো ঘনিষ্ঠ হয়েছি

সুলতার সঙ্গে, সুলতাদের বাড়িতে আরো ক'বার গেছি, ব্যবহার একই রকম। সুলতা ও আমি কখনো একসঙ্গে পড়েছি ওদের বাড়ি। ওর মা নিজে রান্না করে খাইয়েছে। দাদু দেখেছে, কোনো কথা বলে নি। কী যে ভেবেছে সেই জানে। পরীক্ষায় ফার্স্ট হয়েছি। সুলতা চোখের জল ফেলে আমাকে একটা ঘড়ি উপহার দিয়েছিল, কার্স্টমস থেকে ওর বাবা এনে দিয়েছিল ওকে ওর আবদারে।

সুলতার বাবা সুলতাকে বলেছিল; তুই যে এতো মিশিস, ভেবে দেখেছিস।

সুলতা জবাব দিয়েছিল; জানি।

আমাকে সুলতাই বলেছিল ওর বাবার কথা।

মাকে প্রণাম করলুম, মা কেমন ভয়ে মুষড়ে গেল, আনন্দে কোনো কথা বলতে চাইলো না, দূর থেকে আমাকে দেখলো, আমার চোখে চোখ রেখে কেমন যেন কী পড়তে চাইলো মা। অস্বস্তি লাগলো প্রথমে, তারপর নিজের ঘরে গিয়ে একটা বই নিয়ে নাড়া-চাড়া করতে করতে শুয়ে পড়লুম, সকালে বাবার ডাকে জেগে উঠেছি। চা খেতে খেতে বাবা বললো: আমার চাকরির আর এক বছর আছে।

মা বলল; আমি তো চাকরি করছি।

বাবা চুপ করে গেল। আমাকে এখুনি চাকরিতে ঢুকতে হলো না। এই সময় আমাদের দরজার কড়া নড়ে উঠলো, মা দরজা খুলে দিতেই সুলতা দৌড়ে ঘরে ঢুকলো, কাউকে লক্ষ্য না করে আমাকে বললো; বাসু, তোমাকে আজ এক্ষুনি আমাদের বাড়ি যেতে হবে। চলো, গাড়ি আছে।

মা স্তম্ভিত। বাবা অবাক। সুলতার দিকে ওরা দুজনেই তাকিয়েছিল, কোনো কথা বলে নি। মা ভাবছিল মেয়েটির সাহস দেখে। সুলতা আমার হাত ধরে টানতে লাগলো, মা কড়া দৃষ্টিতে তাকিয়ে কঠিন সুরে বললো; তুমি ওর হাত ছাড়ো, ও এখন যাবে না। বাড়িতে অনেক কাজ আছে।

বাবা কোনো কথা না বলে ভেতরে চলে গেছে। বাবার সহ্য শক্তি অপরিসীম। আমার কেমন মনে হলো, নিশ্চয়ই সুলতা কোনো বিপদে পড়েছে। মাকে বললুম ; আমি এখুনি আসছি মা। সুলতা ভয়ে আমার হাত সরিয়ে দিয়েছিল। ওর হাত ধরে আমিই ওকে বাইরে নিয়ে এলুম। ও গাড়ি ড্রাইভ করে আমাকে নিয়ে চললো। যেতে যেতে বললো ; বাসু, আমাকে বাঁচাও, কোনো এ. ডি. এম্-এর সঙ্গে আমার বিয়ে ঠিক করেছে দাদু, বাবা বদলি হচ্ছে, তার আগে বিয়ে দিতে চান আমাকে।

আমি এর কী উত্তর দেবো, বিয়ে তো হবেই ওর, কিন্তু আমি কী করবো, সুলতা কী চায় আমি এখন ওকে বিয়ে করি? ভাবা যায় না। কিন্তু ওর দুঃখ আমি দেখছিলুম, ওর আকুলতা, চঞ্চলতা আমাকে কেমন একপ্রকার আনন্দ দিচ্ছিল, আমি উপভোগ করছিলুম আমাকে ঘিরে ওর তীব্র বেদনার কান্না, এইটুকুতেই আমার আসক্তি, কিন্তু আমি ওর দুঃখে এক হয়ে যেতে পারি না, এই দুঃখের আনন্দে আমাকে মাঝে-মাঝে পীড়ন করে, মনে হয় আমি নিষ্ঠুর, আমি পাষাণ, হয়তো-বা আমি পশু। কিন্তু এক হয়ে মিলতে পারি না। আবার ছেড়ে যেতেও পারি না। চলতে চলতে গাড়িতে সুলতা একবার আবার গায়ের ওপর ভেঙে পড়লো, জোর করে ওকে সোজা করিয়ে দিলুম, পাছে অ্যাক্সিডেন্ট ঘটে। কিন্তু ওর বাড়ি গিয়ে আমার কী কর্তব্য, ওর মা আমার সঙ্গে কিছু কথা বলে, দাদু আকাশের দিকে চেয়ে থাকে, বাবা নির্বিকার। দাদু আকাশের কথা শোনে, আকাশের নীল থেকে নীলের মতো শক্তি পায়, সেই শক্তি দিয়ে ওর আশেপাশের মানুষকে বাঁধে। মাঝে-মাঝে আমাকে ভাবায়, ওর বাবা এতো নির্বিকার কেন? এই নির্বিকারত্বের মানে কি? অসহায় মানেই কি নির্বিকারত্বের অর্থ। যাকে পাই না, পেতে পারি না, তাকে সহ্য করবার শক্তিই এই নির্বিকারত্ব। কিন্তু আমার মনের মধ্যে এই নির্বিকারত্ব কেন, কেন এই দর্শক আমাকে আনন্দ দেয়, আমার সত্তা ও চৈতন্যের মধ্যে কেমন

একটা বিচ্ছেদ, তবু সান্ত্বনার কথা, এই বিচ্ছেদ আমাকে শূন্যতায় নিয়ে যায় না, ভয় জাগায় না, উদ্বেগ তৈরি করে না, এ হলে আমি নিউরোটিক হতে পারতুম। না, আমার শরীর ভালোই আছে। আমার দেহের গর্তে কে যেন নুড়ি ছড়িয়ে কুড়িয়ে আনন্দ পায়।

হাত ধরে নিয়ে গেল সুলতা ওর ঘরে। দাদু ও মা ঘরে ছিল নিজেদের। শব্দ পেয়ে বাইরে এলো, কিন্তু সুলতার ঘরে ঢুকলো না। সুলতা কেঁদে বিছানায় গড়িয়ে পড়লো, সারা শরীরটা কাঁপছে ফুলে ফুলে, চুলগুলি পাখার বাতাসে উড়ছে, ছায়ার মত ছড়িয়ে পড়ছে দুপাশে, পিঠের উপর ব্রা'র হুঁকটা ফুটে বেরুচ্ছে সমস্ত বিচ্ছেদের বেদনাকে উচ্চারিত করে, ওর দেহের রোমকূপে পৃথিবীর ভালোবাসার মতো রেশমি উদ্ভিদ্ জেগে উঠছে চারধারে, ঘাড়ে চুলের নীচে আদিম প্রাণের আনন্দ সবুজ ঘাসের মতো জাগছে, ইচ্ছে হলো ওকে ছুঁয়ে পৃথিবীকে একবার স্পর্শ করি। না, এইতো ভালো, ওকে ছোঁবার পর এই যে দেখার রূপটা, তাতো আর থাকবে না।

সুলতা উঠে বসলো, চোখের জলে দুই কপোল ভেসে গেছে, অদ্ভুত লাগছে সুলতাকে কান্নায়, ওর সুন্দর গৌরবর্ণ কান্নায় গ্লিসারিনে চকচকে হয়ে উঠেছে। সুলতা আমাকে ঝাঁকিয়ে বললো; তুমি কি কিছু বলবে না?

আমি চুপ করে রইলুম। ওর স্পর্শে উন্মাদনা আছে।

সুলতা ঝাঁপিয়ে আমার বুকের ওপর পড়লো, দুহাতে আমার মুখটা ধরে গাঢ় চুম্বন রাখলো ঠোঁটে। ওর সহচর্যে কলেজের মাঠে দেবদারু গাছের নীচে বৃষ্টির জলে যে নোন্তা স্বাদ পেয়েছিলাম, সেই স্বাদ আমি ওর চুম্বনে পেলাম। আমি নিজেকে ছাড়িয়ে নিলাম। উঠে দাঁড়ালাম তাড়াতাড়ি। পাত্র হিশাবে ডি. এম্ অনেক বড়ো। সেখানে আমি কে? কিন্তু তার থেকেও বড়ো কথা, আমার সেই আসক্তি নেই, যাতে ওকে নিয়ে উধাও হয়ে যেতে পারি। সমস্ত বাধা ও বন্ধন কাটিয়ে দুই মেঘখণ্ড একখণ্ড হয়ে আকাশে ভাসতে পারি।

সুলতা ফুঁপিয়ে অস্পষ্ট সুরে বললো ; তুমি কি আমাকে কিছুই বুঝতে পারছো না। ক্রুট্।

সত্যি ক্রুট্।

ওর মা বাইরে থেকে ডাকলো সুলতাকে তীব্র ভর্ৎসনার সুরে। নিস্তব্ধ দাতুর কণ্ঠস্বরে ব্যাঙের মতো গর্জন শোনা গেল। আমি বেরিয়ে আসতে চাইছিলাম, সুলতা আমাকে টেনে জামা ধরে বসিয়ে দিল ওর বিছানায়। আঁচল দিয়ে জল মুছে মাথার চুল ঠিক করে ব্লাউজটা টেনে নামিয়ে আমার দিকে ও ঘরের চারদিকে একবার ঘুরে তাকিয়ে দ্রুত পায়ে বাইরে গেল। আমি শুনতে পেলাম ওর মা বলছে ; একি হচ্ছে লতা ?

সুলতার কোনো কণ্ঠস্বর শুনতে পেলুম না।

ওর দাতু বিনীত স্বরে বলছে ; কিন্তু কণ্ঠের উষ্মা রাগ ক্রোধ তিক্ততা হতাশা বেরিয়ে আসতে চাইছে, দাতুভাই এটা অন্যায় হচ্ছে। ও তোমার ক্লাসমেট, এর বেশি পরিচয় কি আমরা চাই।

সুলতা তীব্র স্বরে বললো ; ভাই দাতু, ওটা আমাকে ছেড়ে দিন।

দাতুভাই বলছে ; না, এ অবস্থায় আমরা ছেড়ে দিতে পারি না।

সুলতা বললো ; বুঝতে পারছি আমার কোনো ফ্রিডম নেই। পড়াশোনা করে ফ্রিডমের যে কনসেপ্শন পেয়েছি, জীবনে তার কোনো স্থান নেই।

সান্ত্বনার ছলে দাতুভাই বললো ; স্বাধীনতা আছে, স্বাধীনতার সঙ্গে যুক্তি না থাকলে এই স্বাধীনতা থাকে না। আমরা তোমাকে এই যুক্তি শেখাতে চাইছি। তুমি এই যুক্তির পথ ধরে স্বাধীনতা লাভ করো, দেখবে মুক্তি পাবে। বাসুদেবকে যেতে বলো, আর বিয়েয় আগে ও যেন আর না আসে বলে দাও। বাসুদেবের বিরুদ্ধে আমাদের কিছু বলবার নেই। ওর মতো ভদ্র শালীন ছেলে দেখি নি।

সুলতা বললো ; এটাই ওর অপরাধ। ওর অভদ্র হওয়া উচিত। জীবনটা এতো ভদ্র সাজানোগোছানো নয়, দাতুভাই।

সুলতার মা চেঁচিয়ে উঠলো ; লতা!

আমি আস্তে আস্তে বেরিয়ে এলুম, দাদু ও মাকে হাত জোড় করে বললুম ; আমি মাফ চাইচি। সুলতা আমি যাই। সুলতা আমার কাছে আসতে চাইলো, পারলো না; সিঁড়ি বেয়ে নেমে এলুম।

হাঁটতে হাঁটতে বাড়ি এলুম, বড় ক্লান্তি লাগছে, রাস্তায় ভিড়, কাদা, গন্ধ, দোকানের লজ্জাহীন ভিড় ও নোংরা, ঘাস, ঘাসের পরেই পাথর, দু একটা কৃষ্ণচূড়া গাছের পাতার ঝালর দুলছে সবুজ আভায়, তার ওপরেই আকাশে চলমান মেঘের বিচিত্র রূপ, সব মিলে, সব মিশে কেমন একটা জগৎ, কোনো কিছু থেকে আলাদা করা যায় না। এবং সমগ্রকে এমনিভাবে দেখলে বড়ো আনন্দ হয়। কিন্তু এই আনন্দ ধরে রাখতে পারি না, মনের এই ধৈর্য থাকে না, শরীর একে বড়ো বাধা দেয়, অন্য বেদনা আঘাত দিয়ে পিষিয়ে মারে। একটু দূর থেকে এই জগৎটাকে দেখতে চাই, সুলতার জন্য দুঃখ হলো, ওর কান্না আমাকে কেমন করে, আমার হৃদয়ের হ্রদে ওই কান্নার পদ্ম কেমন জল থেকে মাথা উঁচু করে উদ্‌গ্রীব হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে আছে, এই পদ্মকে আমি ধরতে চাই না, এই কান্নার পদ্ম অনবরত সুন্দর হয়ে উঠেছে পৃথিবীর শিশিরের জলে। হঠাৎ কোথা থেকে বৃষ্টি এলো।

বাড়ির দরজায় আসতেই দেখি ডাক্তারের গাড়ি। দৌড়ে ঘরে এলুম। বাবা বাড়ি ফেরে নি। পাড়ার লোকেরা এসেছে, মুখে বিভ্রান্তি, ভয় আতঙ্ক, কেউ কোনো কথা বলছে না, মা বিছানায় শুয়ে, চেতনা নেই, চুল ছড়িয়ে পড়েছে, জল দিয়েছে মাথায়, হাত পা ছড়ানো, একটা চাদর পা থেকে মাথা পর্যন্ত, ডাক্তার নাড়ী পরীক্ষা করলেন, বুকে স্টেথিস্কোপ বসিয়ে দেখলেন কিসের স্পন্দন, আমার মুখের দিকে তাকালেন একবার, তারপর সিরিঞ্জ বার করে ওষুধ ভরে ইন্‌জেক্‌শন দিলেন। প্রেসক্রিপশনে একটা ওষুধ লিখে আমাকে তাড়াতাড়ি আনতে বললেন দোকান থেকে। দৌড়ে ওষুধ নিয়ে এলাম, ডাক্তারই খাওয়ালেন। কারো মুখে কোনো কথা নেই, স্তব্ধ

আতঙ্কের ভয় ঘরের ঝুলের মতো ঝুলছে চারদিকে। শব্দ করে বাবা এলো ঘরে, বললো ; কি হয়েছে বাসু। আমি কোনো কথা বলতে পারলুম না, অসহায় ও অপরাধীর মতো দাঁড়িয়ে রইলুম। প্রতিবেশীরা সকলেই আমার দিকে তাকিয়ে আছে। বুঝতে পেরেছে আমিই মায়ের এই অবস্থার জন্য দায়ী। ডাক্তার আরো কিছু করণীয় করে চলে গেলেন, যাবার সময় পরামর্শ দিয়ে গেলেন, চেতনা ফিরে এলে যেন আমরা কোনো কথা না বলি, এবার চৈতন্য ফিরলে যেন তাঁকে আবার ডাকা হয়। সেই অবস্থাটাই ক্রিটিক্যাল।

পাড়ার লোকেরা হাহুতাশ করে যে যার ঘরে চলে গেল। দু একজন রইলো। বাবা দম খেয়ে চুপ করে রইলো। বাবা কি মুক্তির জন্য চুপ করে আছে, না মায়ের এই কষ্টের জন্য দুঃখ পাচ্ছে, বুঝতে পারছি না।

রাত বারোটা পর্যন্ত মায়ের কোনো জ্ঞান ফিরে এলো না। যতোই দুঃখ থাক, চেতনা থাক প্রকৃতি তার নিজের মধ্যে ঘুম পাড়িয়ে দিতে চায়, মিশিয়ে নিতে চায়, তন্দ্রা এলো চোখে, কখন দেয়ালে ঠেস দিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছি, গোঙানো শব্দ শুনতে পেয়ে চমকে উঠলাম সহসা, চোখ রগড়ে তাকিয়ে দেখি মা হাত বাড়িয়ে কী চাইচে, হাতটা ধরলাম, বাবা পাশে বসে, সে-ও অন্য হাতটা ধরলো, মা কী এখন কথা বলতে চাইচে। বাবা বললো, তুমি কিছু বলবে। বেশ তো কাল বলো। আজ একটু ঘুমোও।

আমি ডাক্তারকে ফোন করতে গেলুম। ডাক্তার এলো না। কেউ সাড়া শব্দ দিলো না আমাকে।

মা তখনো চেষ্টা করছে কথা বলতে। মায়ের মুখের কাছে মাথা নিয়ে বললুম ; মা, কী বলতে চাও। এই তো আমি, বাসু।

অস্পষ্ট স্বরে বললো ; বাসু, তুই এসেছিস ?

—হ্যাঁ মা, এইতো

—ও চলে গেছে ? কথা জড়িয়ে এসেছে মার।

—কে মা ? ও; হ্যাঁ।

—বাসু

—মা

—তুই পুড়ে মরবি আগুনে। তুই পথ পাবি না, ছাখ চারদিকে বন। হাঁটতে পারবি না রে। আমার ভয় হচ্ছে তোকে নিয়ে।

—মাগো। এইতো আমি।

—বাসু, তুই কোথায় যাচ্ছিস।

মায়ের তুঃখ মায়ের কষ্ট আমি দেখছি। মা আমাকে জন্ম দিয়েছে আমি মাকে কষ্টের মধ্যে নতুন করে জন্ম দিলুম, এদিক থেকে আমি জনক। বাবা চুপ করে আছে। জানি না, মাতা-পুত্রের কথোপকথনে বাবা কি মনে করছে। উদাস দৃষ্টিতে নিস্তব্ধ রাত্রিতে দেখছে কী যেন বাবা, না, কিছু খুঁজছে না। হারানো বেদনা নেই কোথাও। আমি মায়ের মৃত্যু দেখছি, কষ্টের রূপের মধ্যে একটা বিকৃতি, কিন্তু আমি মাকে আমার মতো পাচ্ছি না কেন ? মা আবার চমকে ডেকে উঠলো; বাসু। তুই ওর সঙ্গে যাস না বাবা।

একি হিংসা ঈর্ষা জ্বালা। না আমার নিয়তি, মা আমার ভবিষ্যদ্বাণী করছে একা, মৃত্যুর মধ্য দিয়ে মৃত্যুর কথা বলছে। মাকে জোর করে চুপ করতে চেষ্টা করলুম; জল খাওয়ালুম, ওষুধ দিলুম ডাক্তারের নির্দেশ মতো। বাবা সব দেখছে।

সকাল বেলা থেকে মা আর কথা বলছে না। হাত পা এলিয়ে দিয়েছে মড়ার মতো, ঠোঁট তুটো লাল হয়ে উঠেছে, চোয়াল নেমে পড়েছে তু দিকে, হাড় জাগছে মুখে, চুলগুলি যেন খুলে পড়ছে। শুধু শ্বাস ছাড়া আর কিছু নেই। জীবন ও মৃত্যুর মাঝখানে মায়ের বুকের শ্বাস হাডুডু খেলছে। মাকে কোথায় ধরেছে। আমি ভেবে পাই না, এই জগৎ কী, ইন্দ্রিয়ময় জগতের স্বপ্নছবি কি ভাসে তখনো, তখনো কি অভিজ্ঞতা ও বেদনার কান্না রূপের তরঙ্গে সমুদ্র জাগায়; এই জন্যই অন্য জগতের প্রতিভাস আনে, সংকেতিত ও রূপান্তরিত

হয়, না গাঢ় অন্ধকার স্তব্ধ হবার আগে যবনিকার পাথরে শুধু ঢেউ, না কি ঢেউও নেই। কী এই জগৎ! জল ও স্থলের মাঝখানে জীবনটা কী রকম; জল থাকে, না মাটি থাকে, কোন্ ভাগ বেশি। মাকে দেখছি না, শুধু শ্বাস, শ্বাস দেখছি।

তিনদিন শুয়ে ছিল মা এমনিভাবে। চারদিনের মাথায় মারা গেল। আকাশ জুড়ে এই অভিশাপ জেগে উঠলো, বাস্থু, তোর জন্যেই আমাকে এই রূপের জগৎ ছাড়তে হলো। আমি পৃথিবী ছাড়তে চাইনি। তোকে নিয়ে আমার নতুন ভুবন ভরাতে চেয়েছিলাম তোর প্রেমে তোর ভালোবাসায়। স্থলতা তোকে হত্যা করবে। ওর চোখে হত্যা ও আত্মহত্যা।

শ্মশান থেকে ফিরতেই দেখি স্থলতা গাড়ি নিয়ে অপেক্ষা করছে। আমি কিছু কথা বললুম না। ওর সামনে দাঁড়িয়ে রইলুম নীরবে। গাড়ি থেকে স্থলতা নেমে এলো, আমার মুখের দিকে তাকিয়ে মুখ নামিয়ে নিল চোখের জল লুকোবার জন্য। ও আর আমার সামনে দাঁড়াতে পারলো না। গাড়ির দরজা খুলে ভেতরে চলে গেল। গাড়ি স্টার্ট দিতেই মাটির ওপর দেখতে পেলুম প্রজাপতি-আঁকা সুন্দর দামী বিয়ের কার্ড। একটা দমকা বাতাসে কার্ডটা উড়ে পাশের নর্দমায় পড়ল। চলে-যাওয়া গাড়িটার দিকে আমি তাকালুম একবার, মিলিয়ে যাচ্ছে, মাকে মুখে আগুন দিয়ে এসেছি শ্মশানে, পুড়ে ভস্ম হয়ে গেল, যেটুকু হল না জলে ভাসিয়ে দিয়ে এলুম। তবু ঘর জুড়ে মা রয়েছে, আমার মনের ঘরে মা শুয়ে আমাকে আলিঙ্গন করে বলছে; বাস্থু, তুই আমাকে ভালোবাসিস নারে। তুই কিন্তু ছেড়ে যাস না।

স্থলতা চলে গেল গাড়িতে, ওর গাড়িটা আমার বুকের পথে দুই পাহাড়ের মাঝখান দিয়ে যাচ্ছে কোথায় একটা গভীর নেশায় পাবার আশায়।

বাবা চুপ করে বসে। আমাদের তেমন কোনো আত্মীয় নেই। বাবার এক দূর সম্পর্কের ভাই তার স্ত্রীকে নিয়ে এসেছে। অনেকগুলি

বাচ্চাকাচ্চা। হবিষ্যির জন্যে মালসা এনেছে তারা।

বাবা কোনো কথা বলছে না। বাবা ভেতরে ভেতরে ক্ষয়ে গেছে। কি জানি, মা কেন বাবাকে এমন অবহেলা করতো, বাবাও কেমন চুপ মেরে থাকতো, সংসারে থেকেও যেন কোনো ব্যাপারে নেই।

আটটার মধ্যেই বাবা আপিশে যায়। ছুটির দিনে হবিষ্যি করছি আমি কাকিমার নির্দেশে, ধোঁয়া উঠছে, চোখমুখ জ্বালা করছে, এভাবে খেতে ইচ্ছে হয় না, মনে হয় ফলমূল খেয়েই থাকি! বাবা আস্তে আস্তে কথা বললো ; বাস্তু, তুই পড়বি ? না চাকরি করবি!

—আমি পড়তে চাই না বাবা। আমি বললুম।

—আমাদের বিদেশি ফার্ম। ডেভেলপমেণ্ট অফিসার দরকার। দেশে বিদেশে যেতে পারবে। মাল চালাবার জন্যে। তোর কথা বলেছিলাম, সাহেব ডিরেক্টার রাজি। তুই ফার্স্ট হয়েছিস।

—আমি রাজি বাবা।

—তুই পড়বি না ?

—আমি আর কি শিখবো বেশি। বেশি কিছু না বাবা।

—আমি তাহলে কাল বলবো।

আমি চুপ করে রইলাম। শ্রাদ্ধের আর দিন তিনেক বাকি। দিন যায়, আমি সময় দেখি, আমার সামনে নাচে কদম্বের পরাগের মতো।

এমনিই দিন যায়; একদিন শ্রাদ্ধের দিন এলো। কারা এলো, কারা গেল, ঠিক জানি না। গঙ্গার ঘাটে নাপিতের কাছে চুল দাড়ি কাটলুম, শাদা কাপড়ে উড়নি গায়ে এলুম খালি পায়ে। মায়ের ছবিটা দেয়ালে। আমাকে নিয়ে মায়ের স্বপ্ন খেলা করতো, এই স্বপ্নে মা কি নিজেকে তার খেলায় বিলিয়ে দিতে পারতো, না, স্বপ্নকে বেঁধে রাখতো তার ইচ্ছায় অহংকারে রোষে জ্ঞানে। হয়তো তাই, তা না হলে মা এতো আঘাত পেল কেন। বাবার সঙ্গে মায়ের সম্পর্ক কি, বোধ হয় কিছু না। অশিক্ষিত হলে সংসারে নরকের আগুন জ্বলতো বাইরে, কিন্তু ভেতরে নারকীয় দাহ, নতুবা নিস্তেজ নিঃসাড়তা।

বাবার কথায় চাকরিতে যোগ দিলুম। বাবাই সব ব্যবস্থা করে রেখেছিলো। ডিরেক্টর আমাকে খুঁতিয়ে দেখলো, কিছু লেখা লিখতে দিলো সাধারণ ব্যাপারে; বয়েসটা জিগ্যেস করলো, চা খেতে দিলো সহাস্যে, প্রশ্ন করলো, কেন আমি আর পড়তে চাই না। যদি পড়তে চাই তাহলে লণ্ডনে ব্যবস্থা করে দিতে পারে। আমি বললুম, না, জীবনকে দেখতে চাই। জানতে চাই। বই পড়ে খুব বেশি হবে না।

ভয় দেখালো নানা জায়গায় ঘুরতে হবে। কোথাও এক জায়গায় থাকতে পারবে না। আমি হেসে চুপ করে রইলুম।

সাহেবি পরিবেশ। নিখুঁত আপিশ। নিখুঁত কাজ, কোথাও চিৎকার হৈ হৈ নেই, কাচের ঘর, টেলিফোন আছে, তাতেই কথা হয়, শুধু শব্দের মধ্যে টাইপরাইটারের শব্দ, কালো অক্ষর শব্দে চিৎকার করছে যেন।

একদিন অন্যমনস্কভাবে হাঁটতে হাঁটতে সুলতাদের বাড়ি গিয়ে পৌছেচি। দেখি ফিরিঙ্গিদের ছেলেমেয়েরা খেলা করছে। ওদের জিগ্যেস করলুম, বললো ওরা এলাহাবাদ চলে গেছে। মেয়ের বিয়ে হয়েছে কৃষ্ণনগর না কোথায়, তারা সেখানে আছে।

সুলতাকে নিয়ে ওদের বিপদ, সেই বিপদ থেকে ওরা মুক্তি পেয়েছে। আর এই বিপদে মা মারা গেল, মৃত্যুও একরম মুক্তি, এই জড় প্রকৃতির ভেতরে শক্তিকণার মতো মিশে গেল, বায়ুতে আকাশে তাপে আলোয় জলে মাটিতে মিশে গেছে, কোটি কোটি মানুষের দেহ এমনিভাবে মিশে যাচ্ছে শক্তিকণায়, এই শক্তিকণাই খাদ্যের মধ্য দিয়ে শ্বাসের মধ্য দিয়ে আমি গ্রহণ করছি, এমনিভাবে লোকের সঙ্গে সম্পর্ক চলছে, আমার অশরীরী চেতনা আমাকে রহস্যের গভীরে নিয়ে যায়। এই রহস্যের কিছু বুঝি, হয়তো সবই বুঝি না। মা এমনি আমার রহস্যের গহ্বরে চলে গিয়ে আমাকে রহস্যের মধ্যে নিয়ে যাচ্ছে। মা কি আমার মধ্যে তার স্বপ্নকে দেখেছিল, সেই স্বপ্ন ভেঙে গিয়েছিল বলে মারা গেল সহসা। কিন্তু কী সেই স্বপ্ন যা বাবার মধ্যে পায় নি। বা পেলেও সেই স্বপ্ন হারিয়ে

গিয়েছিল, নতুন স্বপ্ন তৈরি করতে চেয়েছিল আমাকে নিয়ে। কিন্তু ছেলেকে নিয়ে কোনো মায়ের স্বপ্ন সার্থক হতে পারে না। স্বপ্নের মধ্যে নারী ও পুরুষের যে দ্বৈতলীলা আছে বেদনার কদম্ব বনে, বিচ্ছিন্নতার মধ্যে যে আগ্রহের তীব্রতা আছে, কে.নো ছেলেকে নিয়ে এই তীব্রতা জাগতে পারে না ; যদি জাগে তা পাপের, এবং সেই পাপ ধ্বংস নিয়ে আসে, এই ধ্বংস ছড়িয়ে পড়ে ব্যক্তিতে, সমাজে। এ কী ভাবছি, কী হতে পারে না, এ নিয়ে আমার মাথা ব্যথা কেন ! যা হয়, তাই তো দেখি।

সুলতা নেই। কোনো কালে আমার কাছে ছিল তাও মনে হয় না। তবুতো সুলতা নেই। সময় কালে গিয়ে পৌঁছুতে পারে না। আমি কালকে ধরতে চাই আমার মনের মধ্যে। সেখানে সুলতা ঘুমিয়ে আছে। সে জেগে উঠছে, আড়মোড়া ভেঙে আমার দিকে তাকিয়ে চুপ করে চোখের জল ফেলছে, আমি কিছু বলছি না, সারা আকাশে শাদা মেঘের সম্ভার পাহাড়ের মতো স্তব্ধ, নীচে নদীর জল নীল, শান্ত, কোথাও শব্দ নেই, ঢেউ নেই অথচ মর্মান্তিক স্রোত ভেতরে, স্রোতের ভেতরে নীচে, বনে গাছের ভেতরে শেকড়ে জীবজন্তু প্রাণী লুকিয়ে বাস করছে, এদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক নেই, তাই বিরোধিতা, কিন্তু তবু এদের সকলকে নিয়েই আছি, সকলেই এই বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে ঘুমিয়ে আছে, হয়তো আমার হৃদয়ের গভীরেও ঘুমিয়ে আছে, তাদের আমি জাগাতে চাই না, ক্ষুব্ধ করতে চাই না। কিন্তু এই অক্ষুব্ধ হৃদয়ের বেদনায় সমগ্র জগৎ কি বিচিত্রিত হয়ে ওঠে !

আমার জন্যে আরো আঘাত অপেক্ষা করছিল সামনে। আঘাত কেন ? না জীবন। চাকার চারপাশে বিচিত্র শলাকা, ঘুরছে, দেখা যাচ্ছে না স্পষ্টভাবে। এবং যাকে কেন্দ্র করে ঘুরছে সেও ঘুরছে, কিন্তু স্থির হয়ে আছে। আমি এই স্থির বিন্দুর মতো সমগ্র বেদনা নিয়ে বুকে বসে আছি, না আঘাত লাগছে না। কিন্তু আমার কি এমন শক্তি আছে, আমার ধৈর্য আমার প্রতীক্ষা, আমার কর্ম আমার

দেখা, আমার দুঃখ—এ কি এত শক্তি নিয়ে আমার মধ্যে বিরাজ করে। যদি করে, তাহলে আমি বিচিত্র হতে পারি না কেন ? সেই শক্তি আমার নেই। আমি সব গ্রহণ করে বুঁদ হতে পারি, নিজেকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে মিলিয়ে দিয়ে উধাও হতে পারি না। তাই আঘাত আমার কাছে আসে বটে, কিন্তু জলের নীচে পাথরের মতো চুপ করে থাকে স্বপ্নের মতো।

ফোনে আপিশে ডিরেক্টর বললো, তাড়াতাড়ি অ্যাকাউন্টসে চলে এসো। তোমার বাবা অসুস্থ।

কাজ ফেলে দিয়ে গেলুম। বাবা এলিয়ে পড়েছে। চোখ বোজা। শ্বাসে বুক উঠছে নামছে, বোতামগুলি খোলা, বুকের কাঁচাপাকা লোমগুলি বেরিয়ে পড়েছে জামার ওপর। অ্যাকাউন্টসের সমস্ত লোকেরা ভিড় করে আছে, কারো মুখে কথা নেই। ডিরেক্টর এলো গম্ভীর মুখে, লোকজন ধরাধরি করে বাবাকে গাড়িতে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করলো, আমিও সঙ্গে যাচ্ছি। ডিরেক্টর কোনো কথা বলছে না। গাড়ির দরজা খুলে ভেতরে বাবাকে শুইয়ে দেওয়া হলো, আমি মাথার কাছে বসেছি। অনেকটা দূর যেতে হবে রাস্তা ভেঙে। গাড়ি স্টার্ট দিলো, একটু ঝাঁকুনি লাগলো, তারপর চলতে আরম্ভ করলো জোরে। কিন্তু আমার নিয়তির মতোই রাস্তায় বড়ো খাদ ছিল, রাস্তা সারানো হচ্ছিল, সেখানে গাড়ি যেতেই প্রচণ্ড ঝাঁকুনিতে গাড়ি প্রায় উল্টে যাবার উপক্রম। বাবা একবার ককিয়ে উঠলো; ঘাড়টা আস্তে নুইয়ে পড়লো, হাতটা শিথিল হয়ে গেল, বুকের আর যেন উত্থানপতন হচ্ছে না। আমি একবার জোরে বলে উঠলুম, বাবা! ডিরেক্টর সামনে ছিল, বললো, কী ঘটেছে। বললুম; বাবার শ্বাস নেই মনে হচ্ছে। ডিরেক্টর ড্রাইভারকে জোরে গাড়ি চালাতে বললো, পি. জি.র ইমারজেন্সিতে ঢুকতেই সাহেবকে দেখে ডাক্তারেরা ছুটে এলো, টেবিলে শুইয়ে স্টেথিস্কোপ লাগিয়ে দেখে আমার দিকে তাকিয়ে হতাশ হয়ে একজন বললো; হি ইজ ডেড।

বাবা মৃত। আমার কোলেই মাথা রাখলো সে। আমার কান্না আসছিল না, কিন্তু একপ্রকার দুঃখ আমাকে অভিভূত করে রাখছিল, সেই দুঃখে জগতের সঙ্গে আমি এক হচ্ছিলাম। ডিরেক্টর কিছু না বলে গাড়িতে গিয়ে বসলো। কিছুদিনের মধ্যে আবার আমাকে অশৌচ নিতে হলো। বাবা মাকে নিয়ে সুখী ছিলো কিনা জানি না। তবু একা, একা। একাকিত্ব নিয়ে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারছিলো না। কি জানি। ভেতরে ভেতরে ক্ষয়ে যাচ্ছিল কিনা। কাউকেই ডাকলুম না। নিঃশব্দে কাজ শেষ করে একাকী সম্রাট হয়ে উঠলুম। কিন্তু কিসের সম্রাট, কার কাছে। তবু যেন মুক্তি, এক মুক্তি আমাকে পেয়ে বসলো। কিন্তু এই মুক্তি আমার নিজের ভেতরে। পরম আত্মীয়ের মৃত্যুতেও মানুষ মুক্তি পায়। মানুষ স্বভাবতই নিষ্ঠুর।

এর মধ্যে বোম্বে মাদ্রাজ ঘুরে এসেছি। দেশ দেখা হয় নি, আপিশ শুধু দেখেছি, দেখেছি কাজকর্ম। লোকের ঈর্ষা কুড়িয়েছি।

এমনি ঘুরে ঘুরে জীবন চলছে, কোনো বাঁধন নেই, আমার কাছে কেউ আসেও না। আমি কথা বলি কম, ঘাড় গুঁজে কাজ করি, আপিশের সময়ের বেশি থাকি ঘরে। টাইপিস্ট মেয়েগুলো আমার দিকে তাকায়, চটুল চোখে রিসেপশনিস্ট মেয়েটা আমাকে স্বাগত ও বিদায় জানায়। মিনি স্কার্ট, উরু থেকে পা পর্যন্ত খোলা, মসৃণ চামড়া চকচক করে, আলো পিছলে যায়, আঁটো ব্লাউজ পরে, বুক অনেকটা খোলা, স্তনের দু'পাশ দেখা যায় ; দুই স্তনের মাঝখানে গভীর কালো খাদ নেমে গেছে, ওটা দেখাবার জন্যই ব্যস্ততা, পেটে ভাঁজ পড়েছে চর্বির। দেহের যে অংশগুলি লোভনীয়, যা দেখা যায়, তা দেখায়, স্মার্ট, লজ্জা বা জড়তা নেই, বব্ করা চুলে শ্যাম্পু চিকিয়ে যায়, লম্বা হাইতোলা জুতো পরে। এতে আমার কোনো বিকার নেই। আমি যে কলেজে পড়েছি, সেখানে এই বেশে অনেককে আসতে দেখেছি। বুঝি, আড়চোখে মেয়েগুলি আমার দিকে তাকায়। আমি ভালো মাইনের চাকরি করি, আমার উন্নতি আছে। কেউ কেউ গায়ে পড়ে কথা বলতেও এসেছে। আমার ঠাণ্ডার আঘাতে ওরা সরে গেছে।

বিকেলবেলাটা কী করি এই নিয়ে সমস্যা। সিনেমা দেখতে ভালো লাগে না। একা একা রাস্তায় হাঁটি। আমার তেমন কোনো বন্ধুও নেই। আপিশেও কোনো বন্ধু জোটাতে পারি নি। কেননা বয়সে আমি সকলের চেয়ে ছোট, অথচ বড়ো চাকরি করি। বই পড়তে ইচ্ছে হয় না। বইয়ের অভিজ্ঞতার সঙ্গে আমার অভিজ্ঞতা মেলে না। মেলে না বলেই সত্য নয় তা বলি না, তবে সম্ভাবনার দিক থেকে মনে হয়, সত্যের সঙ্গে যোগ খুবই কম।

ঘরের মধ্যে এলেই মায়ের কথা মনে পড়ে। মায়ের ছবিটা দুলছে। হাসছে। আমার জন্যেই মা মারা গেছে, তবু হাসছে, সামনে বাবার ছবিটা ভেসে ওঠে। বাবার ছবিটা ভেসে উঠতেই মা যেন মুখ ঘুরিয়ে নিলো, হারিয়ে গেল। কোন্ দুঃখ থেকে এই বিচিত্রতা জেগেছে। আমি কি দুঃখের কেন্দ্রে এই বিচিত্র জগৎকে দেখতে পারি। আমার ভেতরে যেন বাবা মা দুজনেই মুখ ঘুরিয়ে বসে আছে। আমি কি মাকেই বেশি ভালোবাসি বাবার চেয়ে! সুলতা এসে মাঝখানে আমার হাত ধরে টেনে নিয়ে যেতে চায় শান্ত নীল জলের ওপরে, যেখানে আকাশের বুকের ছায়া পড়েছে।

নদীর ধারে প্রদ্যুম্নের সেই ঝাঁঝালো চোখ মনে পড়ে, প্রাণের ভয় দেখিয়ে সুলতার কাছ থেকে আমাকে সরিয়ে নিতে চেয়েছিল। পরের কথাই আগে মনে পড়ছে। সুলতা বলেছিল ; আমাদের প্রাণের ভয় নেই।

প্রদ্যুম্ন আমাকে উদ্দেশ্য করেই বলেছিল ; আমার কিন্তু প্রাণের ভয় আছে, চলুন বাড়ি যাবেন।

সুলতা জেদ ধরে বলেছিল ; না, আমরা একটু এখানে থাকবো। তুমিও আমাদের সঙ্গে এসো।

প্রদ্যুম্ন জবাব দিয়েছিল ; আমার এ কাব্যি করা পোষায় না। কারণ আমাকে কাজ করতে হয়। রাত্রেও কাজের ভিড়ে থাকতে হয়।

সুলতা জবাব দিয়েছিল ; তাইতো তোমার সঙ্গে আমার বনলো না। অবসর না পেলে তুমি আমাকে পাবে কি করে। প্রয়োজনে সব ফুরিয়ে যায়।

প্রদ্যুম্ন বলেছিল, অবসরের ফাঁকে জীবনের অর্থ পাল্টে যায়। চলুন বাসুদেববাবু, বাড়ি চলুন। অনেক রাত হয়েছে।

আমি কোনো কথা বলতে পারিনি। শুধু প্রদ্যুম্নের দিকে তাকিয়েছি। ওর ঈর্ষা জ্বালা রাগ অহংকার রাগে ফেটে-পড়া ধিক্কার ওর সর্বাঙ্গে ছড়িয়ে আছে। জগৎকে ও পেতে চায়, কিন্তু জগৎ ওর কাছে বিমর্ষ। আর আমি সব নিয়ে চুপ করে আছি স্থির হয়ে। সুলতার দিকে তাকালুম। জলের ওপরে চাঁদের আলো ও জলের গভীরে ডুবে হাসছে। সমস্ত কালো জল আবরণের মতো মনে হচ্ছে। সুলতা বললো ; এসো, আমরা একটু বসি।

প্রদ্যুম্ন ব্যঙ্গের হাসি হেসে বললো ; কতো রাত পর্যন্ত।

সুলতা বললো ; আরম্ভ শেষের ব্যাপারটা তো কাল্পনিক অভ্যাস। তাকে ছাড়লেই মুক্তি।

প্রদ্যুম্ন থামিয়ে বললো; আমি সে মুক্তি চাই না, কারণ সমাজে আমি অভ্যস্ত।

আমি বললুম ; চলুন। সুলতাকে বললুম ; চলো, সুলতা। আর দেরি করা উচিত নয়।

মনে হলো, সুলতার সমস্ত অন্তরাত্মা শিউরে উঠলো, জলের নীচে আলোর মতো শুয়ে থাকতে চায় হয়তো। ওপরে বনের দিকে তাকিয়ে রইলো। প্রদ্যুম্ন ছটফট করতে লাগলো যেন।

প্রদ্যুম্ন জিপে স্টার্ট দিয়ে হেডলাইট জ্বালিয়ে দিলো। রহস্য খানখান হয়ে গেল। মাটি কেঁপে উঠলো ধীরে। ওপারে গাছের থেকে পাখি শব্দ করে দূরান্তরে হারিয়ে যাবার আগে ডানা ঝাপটাচ্ছে, জলে বাতাসের কাঁপনে চাঁদটা গলে যাচ্ছে, পেছনে বালির পাহাড়, সামনে বাঘের আলো, প্রদ্যুম্ন ও আমার মাঝখানে সুলতা। আমি কিছুটা নির্বিকার, কিছুটা

কৌতুক বোধ হচ্ছে, সামান্য অপরাধ বোধও জাগছে, পরস্ত্রীর সঙ্গে এতো রাত্রে নদীর ধারে বেড়ানো ঠিক হয় নি। কিন্তু আমার মধ্যে সমাজের বোধ খুব কম। কারণ মা বাবার সঙ্গে থেকে সমাজের অন্য লোকদের দেখিনি। আর আমি এতোই নির্বিকার এ ব্যাপারে কেউ কিছু মনে করছে কিনা, তা যেন বুঝতে চাই না। তবুও আমি ভেতরে ভেতরে কিছুটা আতঙ্কিত, আমার সব পাওয়ার শান্তি যেন এই বাঘের আলো ভেঙে দিচ্ছে। হয়তো সুলতা এই চায়, তাই এই অশোভন অবস্থার মধ্যেও ওর আনন্দ ও উল্লাস প্রত্যুম্নকে যতো ব্যথিয়ে তুলছে, তার চেয়ে আমাকে পীড়া দিচ্ছে বেশি। সুলতা যেন প্রতিশোধ নিচ্ছে আমার দুর্বলতার জন্যে। সুলতা ও আমি সাহিত্যের ছাত্র। কিন্তু ওর কথায় যেন কাব্য উপচে পড়ে। কি ইংরেজিতে, কি বাংলায়। ছাত্র অবস্থায় ও ইংরেজি বলতো। বিয়ের পর বাংলা বলে। কিন্তু কাব্যঘেঁষা। আমাকে অভিযোগ করে বলেছিল, কেন তবে সকালে রোদের মতো আমার জীবনে প্রথম আনন্দ নিয়ে এসেছিলে!

ওর যখন বিয়ে ঠিক, তার আগে আমাকে একটা চিঠি লিখেছিল, চিঠিটা হারিয়ে ফেলেছি। ও বোধ হয় এসব কথা বলেছিল, ওর সেসব কথার মধ্যে ওর বাবা-মার প্রতি বিতৃষ্ণা ফুটে উঠেছিল তীব্রভাবে। বাসুদেব, যদি তুমি আমাকে নিলেই না, তবে কেন প্রশ্রয় দিয়েছিলে। তোমার মনের থেকেই তো আমার জন্ম। তাই তো তোমাকে আমি চাই। দুজনের মধ্যে আমাদের ব্যবধান, এবং ব্যবধানের মধ্যেই মিলন। তুমি আমাকে জন্ম দিয়ে আলাদা করে দিচ্ছ না মায়ের মতো! পিতা পরিত্যাগ করতে পারে নতুন সন্তান জন্ম দেবার জন্যে, কিন্তু পুত্র তো পারে না। সন্তান মায়ের গর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ হয়ে আলাদা। মা মনে রাখতে নাও পারে তার শরীরের চরম অবস্থায়। কিন্তু সন্তান যে তারি রক্তে চঞ্চল। বাসুদেব, তুমি ভুলে যাচ্ছো। কিন্তু আমি তো ভুলতে পারছি না। বাসুদেব, জানি, তুমি আমাকে ভুলতে পারো না। নির্বিকার হয়ে থাকতে চাও। কিন্তু কেন! তোমার চিত্ত কি ক্ষোভিত

হতে পারে না আমার শক্তির মায়ায়। বাসুদেব, তোমাকে বুকে নিয়ে আমার যৌবনের বেদনার আনন্দে মিশে যাবো। আমি যে তোমাকে ভালোবাসি, তোমার ভেতরে কি আমার ভালোবাসা রাগ দ্বেষ অহংকারের কোনো চিহ্ন নেই ?

সব চিহ্ন কোথায় জমে আছে গোপনে। চমকে উঠলো শরীর যখন গাড়ি থামলো। মা বাবাকে ভালোবাসতো না, বাবা মাকে ভালোবাসতো কিনা জানি না, কিন্তু কোনো বিরূপতা ছিল না। তাই দুজনের বুকের ওপর নির্জন ছায়ার ভয় ছিল, সে ভয় মায়ের মধ্যে ঘৃণার, বাবার মধ্যে ঠাণ্ডা বাতাসের। মায়ের অভিশাপ মনে পড়ে মৃত্যুর সময়ে, সুলতা আমার জীবনে অভিশাপ আনবে। কোন্ অভিশাপ। একি শূন্যতার, একাকিত্বের ? আমার একার মধ্যে তো কোনো নিঃসঙ্গতা নেই। মা বাবা সুলতা এই জগৎ কেমন এক হয়ে আছে। তাদের আমি হারাতে চাইনা, এড়াতে চাই না, সব নিয়ে থাকতে চাই। আমার হৃদয়ের অন্ধকারে।

সুলতার ওখেনে যাবার আমার কোনো সুযোগ ছিল না। কিন্তু অকস্মাৎ সুযোগ ঘটে গেল। প্রদ্যুম্নের বিপদ জেনেই গিয়েছিলুম, যাতে আমি ওর কোনো উপকারে আসতে পারি। না, আমার উপকার ও নেবে না। আমাকে প্রদ্যুম্ন ঈর্ষা করে। আমার কাছে নত হতে চায় না।

সলিল ব্যানার্জি বলে এক সাংবাদিক একদিন আমার কাছে এসেছিল আমাদের ব্যাবসার খবর জানতে। বিদেশি ফার্ম কতো মুনাফা লুটছে, তারি হিশেব নিতে এসেছিল। আমাদের বার্ষিক রিপোর্ট, সরকারের কাছে চিঠিপত্র, রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হিশেব সব জানতে চায়। ডিরেক্টর আমার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছে ওকে। কিন্তু আমরা কেন সব বলতে যাবো। যতোটুকু কাগজে ছাপানো যায়, ততোটুকুই জানালুম। তাতেই খুশি। এবং ওকে দিয়ে এই তথ্যটা ছাপিয়ে দিলুম, আমরা আমাদের টাকায় এখানকার শিল্পকে উন্নত করছি, এবং অনেক লোকের

অন্নসংস্থান করছি। শুধু তাই নয়, সলিলদের পত্রিকায় আমাদের কোম্পানির বছরে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয় তিরিশ লক্ষ টাকার। আমাদের হাতে রাখতেই হয় ওদের। বিজ্ঞাপনদাতাকে চটাতে পারে না। আমাদের কোনো অনুষ্ঠান হলে ফলাও করে ছবিসহ সংবাদ ছাপে। অনুরোধ করলে কথা রাখে না তা এখনো ঘটে নি। সলিল বিয়ে করে নি, সুতরাং আমার সঙ্গে খাতিরটা বেশি। আমি ওর বাড়ি একদিন গেছি। অরবিন্দের ভক্ত। শৌখিন জিনিসে সব ভর্তি। টেপরেকর্ডার স্টেরিও টেলিভিশন আছে। বাড়িতে মদ খায় না বোন ও মায়ের জন্যে। বাইরে খায়। আমাকে অফার দিয়েছিল। আমি খাই নি। চাইনিজ রেস্টুরেণ্টে বসে মাঝে মাঝে খাওয়ায়, আমিও সুযোগ পেলে খাওয়াই। ওর সঙ্গ আমার তেমন খারাপ লাগে না।

সলিলের কাছেই শুনলুম কোথাকার এক ডি. এম্. বিপদে পড়েছে। কেননা সে মন্ত্রীপুত্রকে ধরিয়ে দিয়েছে বনে হরিণ শিকার করেছে বলে। সেই ডি. এম্. সলিলের বন্ধু। ডি. এম্.-এর নাম প্রত্যুম্ন।

একদিন বিকেলের দিকে আপিশে এলো সলিল। বললো ; আজ আপনাকে এক জায়গায় নিয়ে যাবো। আমার বন্ধুর বাবার কাছে। তিনি বিখ্যাত অধ্যাপক।

আমার গাড়িতেই সলিল এলো। কলিঙ্বেল টিপতেই চাকর দরজা খুলে আমাদের নিয়ে চললো ভেতরে। অধ্যাপক পঙ্গু। চেয়ারে বসে থাকেন। বই পড়েন, টেবিলে লেখাপড়া করেন আপন মনে। সলিল ঘরে ঢুকে প্রণাম করলো। শান্ত স্বরে তিনি তাকে বসতে বললেন, সলিলই প্রসঙ্গ তুললো প্রত্যুম্নের। বললো ; স্যার কী করি! প্রত্যুম্নের ব্যাপারটা মনে করছি আমাদের কাগজে ফ্ল্যাশ্ করবো।

আস্তে আস্তে কেটে কেটে বললেন অধ্যাপক; তাতে ওর কোনো লাভ হবে!

—ওর কী লাভ হবে স্যার জানি না। তবে মন্ত্রীর ছেলে যে অপরাধ করেছে, সেটা জানানো হবে।

—সেটা জানিয়ে লাভ কি।

—লাভ, মন্ত্রী হলেও শাসন ও বিচার থেকে রেহাই নেই।

—এতে তুমি বিপদে পড়বে না বন্ধুকে উপকার করতে গিয়ে।

—আমার স্যার কী বিপদ! সলিল তাচ্ছিল্যের হাসি হাসলো।

—মন্ত্রীর বিরুদ্ধে লিখছো।

সলিল আবার হাসলো। আমি চুপ করে শুনছিলুম ওদের কথা। কতো আস্তে এবং কতো দৃঢ়তার সঙ্গে কথা বলেন অধ্যাপক। সব কথা মেপে বলেন। মুখ তুলে অধ্যাপক বললেন; আমার মনে হচ্ছে প্রদ্যুম্ন বিপদে পড়বে। এবং তুমিও তার সঙ্গে জড়াবে।

সলিল কোনো কথা বললো না। তিনি আবার বললেন; বসো, চা খাও। আজ হয়তো প্রদ্যুম্ন আসতে পারে।

সলিল পুলকিত হয়ে বললো; তাই নাকি! আমার দিকে তাকিয়ে বললো; তাহলে আপনার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবো। আমাদের ক্লাশে সব চাইতে সেরা ছাত্র ছিল প্রদ্যুম্ন।

চাকর এসে চা ও চারটে করে মিষ্টি দিয়ে গেল। সলিলই আমাকে পরিচয় করিয়ে দিলো ওঁর সঙ্গে। তিনি বললেন; তুমিও তো ভাল ছাত্র। তোমার নাম আমি শুনেছি। পড়লে না কেন আর? আর তোমার বিদ্যা বুদ্ধি দেশের জন্যে না লাগিয়ে বিদেশিকে মুনাফা লুটতে সাহায্য করছ। দেশের কাছে তোমার ঋণ নেই!

আমি একথার কি উত্তর দেবো। চুপ করে রইলুম। তিনি বললেন; দেশের উৎপাদনে তোমাদের মতো প্রতিভা কাজে লাগুক, এটা আমি চাই। সব দেশই সব মানুষের, কিন্তু আমার জন্মস্থানটা আমার।

এমন সময় অধ্যাপকের স্ত্রী এলেন ঘরে। মুখে একটা প্রশান্তি ও দীপ্তি। তিনি সকলকে দেখতে পেয়েই বললেন; সলিল, তুমি কতক্ষণ এসেছ। এইমাত্র ফোন এলো, প্রদ্যুম্ন আসছে। স্টেশন থেকে জানাচ্ছে। সলিল খুবই খুশি হলো এই সংবাদে। স্বামীর দিকে তাকিয়ে বললেন; তুমি আজ একটুও বিশ্রাম করো নি। আজ সব কাজ

থাক। এই হরলিক্সটুকু এনেছি, তুমি খেয়ে নাও।

শান্ত সুরে অধ্যাপক বললেন ; দিল্লি থেকে একটা পেপার চেয়েছে ; কালই পাঠাতে হবে। আমার জন্যে ব্যস্ত হয়ো না। আমার ভারি খারাপ লাগে, আমি তোমাদের কিছুই দেখতে পারি না। ভগবানও আমাকে পঙ্গু করে দিয়েছেন।

—তুমি তো দেখছই—স্ত্রী বললেন ; তুমি না দেখলে সংসার চলছে কী করে। প্রদ্যুম্ন মানুষ হলো কী করে। তুমি দেখছ বলেই তো তোমাকে দেখা আমাদের কর্তব্য। ভগবানতো সকলকে সব ক্ষমতা দেন না, বা দিলেও রাখেন না। তোমার অভাব যদি আমরা পূর্ণ করতে না পারি তাহলে আমাদের অভাব তুমি পূর্ণ করবে কী করে। তোমার ভেতরে যে শক্তি, সেই শক্তি দিয়েই তো আমাদের বাঁচিয়ে রেখেছ।

অনুযোগের সুরে অধ্যাপক বললেন ; না, তাহলেও আমার দায়িত্ব থেকেই যায়।

—জীবনে অনেক দায়িত্ব পালন করেছ। এখন বিশ্রাম করো। নাও, এই খাবারটুকু খেয়ে নাও।

ইচ্ছে হলো ভদ্রমহিলাকে প্রণাম করি। জীবনের অভাবটাকে তিনি পূর্ণ করে দিয়েছেন জীবনের ভালোবাসায়, এবং পরের অভাবটাকেও পূর্ণ করে দিয়েছেন মমতায়। সব অভাব জীবনে পূর্ণ হয় না বাস্তবে। আমরা মনে সেই অভাব পূর্ণ করি। করতে চাই। আমার বাবা, মা'র জীবনে কখনো এ জিনিস দেখি নি। পরিবারের এই গভীর ভালোবাসা ও মমতা এঁদের পূর্ণ করে তুলেছে। অধ্যাপক খাওয়া শেষ করে জল খেলেন। গ্লাসটা হাতে তুলে নিয়ে বললেন অধ্যাপকের স্ত্রী ; সলিল, ওঁকে আর বকিও না আজ। একটু বিশ্রাম করতে দাও। তোমরা বরং আমার ঘরে এসো।

—না না, ওরা এখানেই থাক। অধ্যাপক বললেন।

—স্যার,ছাপিয়ে দিই। তারপর যা হবে।

—তুমি যা ভালো বোঝো।

বাইরে একটা গাড়ি এসে দাঁড়ালো। পর্দা ফাঁক করে অধ্যাপকের স্ত্রী জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে বললেন; প্রদ্যুম্ন এসেছে বৌমাকে নিয়ে। অধ্যাপক একটু চঞ্চল, বললেন; তাই নাকি!

আমি হতবাক হয়ে গেলুম, সুলতা ঢুকছে প্রদ্যুম্নের পেছনে। প্রদ্যুম্ন আমাকে লক্ষ্য করে নি। সোজা অধ্যাপকের পায়ের কাছে এসে প্রণাম করলো পা ছুঁয়ে, তারপর মাকে। সুলতা থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো মুহূর্তে আমাকে দেখে। চোখে বিস্ময় আনন্দ এবং ভয়। নিজেকে সামলে নিলো। প্রদ্যুম্নের মতো সুলতাও অধ্যাপক ও অধ্যাপকের স্ত্রীকে প্রণাম করলো ভক্তি ভরে। আমার দিকে একবার তাকালো। কিন্তু কোনো কথা বললো না। সলিলকে সুলতা লক্ষ্যই করলো না। অধ্যাপকের স্ত্রী বললেন; বৌমা, ভালো আছো!

সুলতা ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালো।

সলিল জোর দিয়ে হেঁকে বললো; প্রদ্যুম্ন ভালো আছো! তোমায় ওই ব্যাপারটা কতো দূর গড়ালো?

প্রদ্যুম্ন তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে বললো; গড়ানো না গড়ানোর ব্যাপার নেই। যা ঘটবার ঘটবেই।

—আমি সংবাদ ছাপিয়ে দেব।

—ভালোই তো।

—পরিচয় করিয়ে দিই, আমার বন্ধু বাসুদেব ভট্টাচার্য। শ কোম্পানির মার্কেটিং অফিসার, আর আমার বন্ধু প্রদ্যুম্ন চৌধুরী, ডি. এম.।

আমি হাত জোর করে নমস্কার জানালুম। ভদ্রতার খাতিরে প্রদ্যুম্ন কোনো প্রকারে হাতটা ওঠালো, কিন্তু কোনো আন্তরিকতা নেই। সুলতা এতক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়েছিল। অধ্যাপকের স্ত্রী অধ্যাপকের জন্য ভেতর থেকে প্রেসারের ওষুধ আনতে গিয়েছিলেন। সুলতা বললো; বাসু, তুমি এখানে? অধ্যাপক বললেন; বৌমা, তুমি ওকে চেনো!

—হ্যাঁ বাবা, আমরা একসঙ্গে পড়েছি।

সলিল অবাক হয়ে বললো; তাই নাকি। ভারি মজারতো।

আমি চুপ করে রইলুম। প্রদ্যুম্ন আমার দিকে তাকাচ্ছিল, ভাবছিল একি হলো! অধ্যাপকের স্ত্রী এসে ওষুধ দিলেন, শেষের কথা শুনেছিলেন ; বৌমা, তোমার সহপাঠী!

সুলতা ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালো। অধ্যাপকের স্ত্রী আমার দিকে নীরবে বিস্ময়ে তাকালেন, প্রদ্যুম্ন উঠে ভেতরে গেল। আমি সলিলকে বললুম ; দেরি হয়ে যাচ্ছে, আজ চলি।

অধ্যাপকের স্ত্রী বললেন ; পরে এসো।

সুলতা বললো ; তুমি এখুনি যাবে?

অধ্যাপককে নমস্কার জানিয়ে বাইরে এলুম। সলিলও এলো। বাইরে বেরিয়ে এসে সলিল বললো ; বড়ো অদ্ভুত কাণ্ডতো! কী করে যোগাযোগ হয়ে গেল। কিন্তু প্রদ্যুম্ন আপনার সঙ্গে কথা বললো না।

কিন্তু কার যোগাযোগ। মায়ের এই কি অভিশাপ! মা তুমি কী বলছ? বাড়ি এসে সেদিন বড়ো বিব্রত বোধ করেছিলুম। শুধু স্মৃতি, ছবি, ইচ্ছাটা শুধু ছবি দেখবার, আর ঘটনার বেদনার। সুলতা সুন্দর দেখতে হয়েছে, ওর লাল শাড়ির সঙ্গে লাল ব্লাউজ, ওকে যেন বিয়াত্রিচের মতো মনে হচ্ছে। না, আমি দান্তে নই। তবু ওই দৃশ্যটাই ভাসছে। আমি কি ভাবছি। অনেক রাত পর্যন্ত ঘুম এলো না।

দিন সাতেক বাদে সলিলের কাছ থেকে একটা ফোন পেলুম। কে. সি. দাশে দেখা করতে বলছে। ওর খুব বিপদ। চাকরি নিয়ে টানাটানি। আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছি, কী ব্যাপার!

দেখা হতেই সলিল বললো ; এসেছেন? আসুন, ভেতরে বসি।

দুকাপ চায়ের অর্ডার দিয়ে বললুম সলিলকে ; কী হয়েছে?

সলিল কেটে কেটে বললো ; প্রদ্যুম্নের নিউজটা ছাপিয়ে দিয়েছি, তাতে মন্ত্রীপুত্রের ওপর কটাক্ষ ছিল। মন্ত্রী কাগজের মালিককে ফোন করেছে, বলেছে, এ নিউজ আমাকে না জানিয়ে ছাপানো হয়েছে কেন ; মন্ত্রীর ফিনান্সের পোর্টফোলিও, মালিককে নাকি বলেছে সরকারী বিজ্ঞাপন বন্ধ করে দেবে। মালিক এত উঁচুতে, আমি তার সঙ্গে দেখা করবার

অধিকার পাই নি। ডিপার্টমেণ্টের চার্জে যে আছে সে আমাকে শো-কজ করবার অর্ডার দিয়েছে।

আমি চুপ করে রইলুম। সলিল চায়ে চুমুক দিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে আছে, চোখে মুখে আতঙ্ক ভয়, অথচ অস্বীকার করবার একটা তেজ প্রকাশ পাচ্ছে; চাকরি গেলে অসুবিধে হবে ওর, ওর ওপর পাঁচজন নির্ভর করে আছে, ওর একার কোনো দায়িত্ব নেই। গড়িয়ে গড়িয়ে জীবনটা কাটিয়ে নিয়ে যাবে, সলিল আমার সাহায্য চায়, কিন্তু মুখে বলতে পারছে না, অথচ ভেতরে ভেতরে দারুণ উদ্বেগ। আমি বললুম; কী করতে পারি বলুন?

একটু হেসে চুপ করে রইলো, চা ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে, ওর হাতের আঙুলগুলি কাঁপছে ভীষণ। ওর দিকে তাকিয়ে কললুম; দেখি কী করতে পারি। মালিক আমার কথা শুনবে তা মনে হয় না। তবে চেষ্টা করে দেখবো। সলিল কাপডিশগুলো পাশে সরিয়ে রাখলো, অধীর আগ্রহে আমার দিকে ঝুঁকে পড়লো একটু, মুখে কোনো কথা নেই, কৃতজ্ঞতার আর এক ভঙ্গি। আমি বললুম; বড্ডো গরম, চলুন, বাইরে যাই।

সলিলই জোর করে পয়সা দিলো। বাইরে বেরিয়ে একটু হাঁপ ছেড়ে বাঁচলুম, আমি সলিলকে বললুম; আপনি কোথায় যাবেন?

সলিল বললো; আমি একটু উকিলের পরামর্শ নেবো।

মনে মনে আমি বললুম; উকিল কি সলিলের চাকরি রক্ষা করতে পারবে। মালিক যেখানে সব, সেখানে আইন কোথায়। আইন কোথাও নেই। প্রতারণা ছাড়াই মানুষ প্রতারিত হয়, এই দুঃখ মানুষের সব চেয়ে বেশি। আমি কী অপরাধ করেছি জীবনে যার জন্যে আমার এই দুঃখ, এই নির্যাতন। সত্যি কি আমি নির্যাতিত হচ্ছি? না কি এটা আমার একটা কাল্পনিক চেষ্টামাত্র। কিন্তু আমার এই মানসিক চেষ্টাই বা কে তৈরি করছে আমার মধ্যে, এই বেদনা সংবেদনা আমাকে নাড়ায় কেন!

ব্যাকুল হয়ে, অথচ সংযতভাবে বললুম; প্রদ্যুম্নের কিছু হলো এতে?

সলিল লজ্জিত হয়ে বললো ; ভুলে গেছি আপনাকে বলতে। ওকে সরাবার চেষ্টা চলচে। আমি সেক্রেটারিয়েটে গিয়েছিলুম, ওখানে শুনলুম। আবার এর মধ্যে আর একটা ঘটনায় প্রত্যুম্ন জড়িয়ে পড়েছে, গুঁড়ো দুধের প্যাকেট ধরেছে। একজন এম্. এল্-এ এ ব্যাপারে জড়িত। মন্ত্রীরা এই এম্. এল্-এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। অথচ ওদের মধ্যে বিবাদ ছিল। সকলে মিলে প্রত্যুম্নকে তাড়াবার চেষ্টা করছে।

—প্রত্যুম্নের সঙ্গে আপনার দেখা হয়েছিল এর মধ্যে ?

—হ্যাঁ, একবার কলকাতায় এসেছিল। কথা হয়নি তেমন। তবে প্রত্যুম্ন লড়াইয়ের জন্যে মরিয়া হয়ে উঠেছে।

আমার হাসি পেল, স্থূলতার কাছে ধাক্কা খেয়ে বাইরে অনবরত ধাক্কা দিয়ে চলেছে, প্রত্যুম্নের জন্য দুঃখও হলো, প্রত্যুম্নের ভেতরের শূন্যতা বাইরে এমন কাজে সংগ্রামে প্রকাশ পাচ্ছে, সে লড়াই করে ভুলে থাকতে চায়। এর জন্যে আমিই কি দায়ী ? আমিই কি পাপ তৈরি করেছি, যে পাপে আমরা তিনজন একই সঙ্গে যুক্ত ও জড়িত। এই পাপের প্রকৃত অর্থ কী, সত্যি কি পাপ, না পাপ একটা ভৌগোলিক সংস্কার, ওর অন্ধকার আলোর মধ্যে, ওর বুদ্ধি ও মনের মধ্যে আমি কি দস্যুর মতো লুণ্ঠন করে নিয়ে একা ভোগ করছি, প্রত্যুম্নের বোধের সঙ্গে, ওর মান ও আনন্দের সঙ্গে আমার নিভৃত আনন্দ কখনো মেলে না, তাই নীড় খুঁজে পায় না ; প্রত্যুম্ন, কিন্তু আমিই কি নীড় খুঁজে পেয়েছি, আমার আঁধার ঘরে কি আলো জ্বলে কখনো আনন্দের বেদনার, সব মিলে কি আমার ব্যক্তিত্ব পূর্ণতা পায়। সামঞ্জস্যের পূর্ণতাই পবিত্রতা, এই পবিত্রতাই কি আমার মধ্যে ফুলের মতো ফুটে ওঠে পূর্ণতায়। না, আবার ধাক্কা খেলুম, এই সমস্ত প্রকৃতি, প্রকৃতির মধ্যে ফুল একটা অঙ্গ, মাটি থেকে আলো থেকে বাতাস থেকে কোনো রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় সে শুধু গন্ধ বার করে নেয়, গন্ধ মিলিয়ে দেয়, তার রূপের মধ্যে সুষমতা ফুটে ওঠে। প্রতিটি পাপড়িতে পাপড়িতে সুষমতা, সুষ্ঠ বিন্যাস, আর স্পষ্টতা। এই সুষম স্পষ্টতায় হয়তো সেকেলে লোকদের

মনে সুন্দরের জন্ম দিয়েছিল, কিন্তু ফুলের পাশেই কাঁটা, গাছের নীচে কেঁচো, সাপ, কেন্নো, অসংখ্য বিষমিষাময় জীব, ঘরের সুন্দর ড্রয়িঙ্-রুমের মাঝখানেই টিকটিকি, মাকড়শা, শুঁয়ো পোকা, ক্যাকড়া বিছে, এত সুন্দর ফুলের পাপড়ি ঝিঁঝিঁ পোকা রাত্রির অন্ধকারে আলো জ্বালিয়ে ফুটো করে দেয় কখন। মানুষের আকাঙ্ক্ষা সুষম স্পষ্টতাকে অধিকার করে নেওয়া, সব কিছু থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে আদর্শের মধ্যে থাকা, কিন্তু তাতো মানুষের হবার উপায় নেই, সে সব কিছু জড়িয়ে আছে, পৃথিবী যেমন ভালোমন্দ অসংখ্য ছোটবড় জীব নিয়ে পাহাড় সমুদ্র নদী-বন জঙ্গল নিয়ে জেগে আছে, তেমনি আমরাও জেগে আছি দিন রাত্রি, আমাদের ঘুম হয় না, স্বপ্নে দুঃস্বপ্নে জাগরণে আমরা জেগে আছি, কথা বলতে পারি না; সমস্ত কথার নীরবতা আমার মনের মধ্যে বিন্দু হয়ে সমগ্র সত্তাকে ধরে আছে, এই নীরব বিন্দুর কেন্দ্রের আলো আমাদের ভরিয়ে রাখতে পারে না কখনো, তাইতো এতো বিভ্রম বিভ্রান্তি, সব নিয়ে এই বিভ্রান্তি অতিক্রম করতে পারলে সেই বিন্দুকে জাগিয়ে একা শুচি বা পবিত্র হতে পারা যায়। এই শুচিস্মিত বিন্দুকে কখনো আমরা উপলব্ধি করতে পারি না, কখনো তার সম্বন্ধে সচেতন হই না। আমার ভেতরে এই শুচিস্মিত বিন্দুর আলোই কি সুলতা?

এ্যাই, কি করছেন, কোথায় যাচ্ছেন, চাপা পড়বেন যে—বলে সলিল আমাকে হেঁচকা টানে ফুটপাথে নিয়ে এলো। লজ্জিত হয়ে ওর কাছে ক্ষমা চাইলুম। হাঁটতে ইচ্ছে করছিল। আমার মনের প্রতি স্তরে স্তরে পলিমাটির মতো সমস্ত বেদনা আকাঙ্ক্ষা সংগীত শিল্প আলো ভালোবাসা ঘুমিয়ে আছে, সব জমে জমে যেন নতুন কিছু হতে চাইচে। বুকের ভেতরে মুখ লুকিয়ে দেখলুম, বাবা ও মা দুজনে পিঠ উল্টো করে বসে আছে।

সলিল আমার অন্যমনস্ক ভাব দেখছিল, হাত ধরে বললো; চলুন, বারে কিছু খাই।

আমি বললুম ; না, এমনিই হাঁটুন। আপনার ব্যাপারটা ভাবছি। কী করা যায়।

ভালো লাগছিল না, ওকে বিদায় দিয়ে গাড়ি করে বাড়ি ফিরে এলুম। একা, অন্ধকার ঘর। আলো জ্বালানোই আছে, তবু মনে হচ্ছে কোথাও আলো নেই। আমার মধ্যে নিস্পৃহতা কেন? আমি কি ভিতু, কাপুরুষ, সরে সরে আসি, দায়িত্ব নিতে চাই না? আমার বুকের ভেতরে মা ও বাবা বসে আছে মুখ ঘুরিয়ে। স্থলতা মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে আমার দিকে মুখ উঁচু করে, বাবা ও মা ওকে কেউ দেখতে পাচ্ছে না, স্থলতা আমার দিকে এগোতে পারছে না, আমিও ওর কাছে যেতে পারছি না। হঠাৎ জলের ঢেউএ সব কেমন ঢেকে গেল, শুধু অকূল জল, জলের বিন্দুর মতো একটা বিন্দু আমাকে টানছে। আমি গভীরে, গভীরে সেই বিন্দুর কাছে যাচ্ছি।

ক'দিন যাবৎই সলিলের কথা ভাবছি। কী করি। এমনি ফোন করলে বা গিয়ে দেখা করলেও কিছু হবে না, বরং ওদের কাছে খেলো হতে হবে। ভবিষ্যতে কোনো কাজও করানো যাবে না ওদের দিয়ে।

দিল্লি আপিশ থেকে একটা ট্রাঙ্ককল এলো। ওখানকার এক কর্মকর্তা এখানে আসবে কিছুদিনের জন্যে আমাদের কাজকর্ম দেখতে। আমাকেই ভার দেওয়া হলো এয়ারপোর্টে রিসিভ করবার জন্যে।

গাড়িতে আনতে আনতে কথা হচ্ছিল ওদের দেশের তুলনায় আমরা এখনো কতো পিছিয়ে আছি। ওদের জাতীয় চরিত্র আছে, কিন্তু আমাদের নেই।

এসব কথা শুনতে শুনতে আমি অভ্যস্ত। শুধু মুচকি হাসছিলুম। হঠাৎ এক সময় চমকে দিয়ে বললো ; ডু ইয়ো লাইক টু ভিজিট ইংল্যাণ্ড।

আমি ওর মুখের দিকে তাকিয়ে চুপ করে রইলুম। কিন্তু আমার

পিঠে চাপড় দিয়ে বললো, ইয়ং বয়। ভেরি গ্লাড টু মিট ইয়ু।

স্মিথ্‌কে নিয়ে ক'দিন হৈহৈ করে কাটলো। হিশেবপত্তর খাতা সব দেখলো, খুঁটিয়ে অনিয়ম চোখে আঙুল দিয়ে দেখালো, সেক্‌শনের ইনচার্জকে ধমকালো নরম করে। দুদিন বাদেই দিল্লি চলে যাবে আবার। এ্যায়ারের টিকিট কেনা হয়েছে। সেদিনই ঠিক হলো যাবার আগের দিন একটা প্রেস-কন্‌ফারেন্স করতে চায়। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে ইন্‌ভিটেশন কার্ড ও যোগাযোগ করতে হলো আমাকে। এই সুযোগে সলিলের পত্রিকা আপিশে গেলুম। খোদ মালিকের সঙ্গে কার্ড দিয়ে দেখা করতে চাইলুম ওপরে, এর আগেই ওর সেক্‌শনের ইন্‌র্জাজকে চিঠি দিয়েছি, টি-পার্টি'র কথা লেখাই আছে। মালিক আমার কার্ড পেয়েই ডেকে পাঠালেন প্রায়। সত্তর বছর বয়েস, চুল কোঁকড়ানো, কলপ দেওয়া, চোখে রিমলেস চশমা, চোখ দুটোতে ঔজ্জ্বল্য ও তীক্ষ্ণতা, সাহেবি ভদ্রতায় উঠে দাঁড়িয়ে স্বাগত জানালেন আমাকে। কার্ড দিলুম, এবং আসবার জন্যে বারবার বললুম। প্রায় উঠে আসবো সেই সময়ই সলিলের কথা বললুম; স'লিল ব্যানার্জি আপনাদের রিপোর্টার। আমাদের অনেক রিপোর্ট ছাপিয়েছে, তাতে আমাদের ভাল ইফেক্ট হয়েছে। আমাদের কোম্পানি চায় সে-ই আসুক। কারণ কোম্পানির সব তথ্য ও জানে। ওর পক্ষে সুবিধে হবে। আপনার যদি আপত্তি না থাকে—।

ভদ্রলোক তুখোর চালাক। নীরবে চোখ তুলে তাকালেন, কোনো কথা বললেন না, শুধু হাসলেন। আমি বিদায় নিয়ে চলে এলুম শঙ্কিত মনে।

প্রেস-কন্‌ফারেন্স ভালোই হলো, যদিও খাবার অপর্যাপ্ত, সলিল এসেছিল, আমার সঙ্গে কোনো কথা বলেনি। আমি খুশি হলুম, মালিক আমার কথা শুনেছেন। কিন্তু সলিলের চাকরি থাকবে কিনা বুঝতে পারছি না। স্মিথ্‌ চলে গেল দিল্লি আপিশে। ফলাও করে আমাদের কোম্পানির রিপোর্ট বার হয়েছে সলিলদের কাগজে।

আরো কয়েকদিন বাদে সলিল প্রায় লাফাতে লাফাতে এলো আমার ঘরে। প্রায় জড়িয়ে ধরবার মতো বললো; কী উপকার যে

করেছেন আপনি। আমার কাছে একটা অ্যাপলজি চেয়ে নিয়ে শো-কজ উঠিয়ে নিয়েছে। আর বলেছে, কোনো রিপোর্ট যেন সেক্‌শানের ইনচার্জকে না জানিয়ে ছাপা হয়।

যাক্‌, তবু একটা কাজ করা হলো। একটু হাসলুম চুপ করে। কথা বলতে পারলুম না ওর সঙ্গে। অনেকগুলি ফাইল পড়ে আছে। ও বুঝতে পারলো, একটু বাদেই চলে গেল আর একবার একগাল হেসে। সলিলের জন্যে বড় টাকার একটা ইন্‌সাব্‌শন দিলুম, যেটা এ সময় ওদের পত্রিকা পায় না।

বিকেলে আবার এলো সলিল আমার কাছে, মুখে হাসি এবং উচ্ছ্বাস, ওকে নিয়ে বাড়িতে এলুম আমার, বাড়ি অন্ধকার, সামনে তালা বন্ধ, আমার কাছে চাবি ছিল, চাবি বার করে তালা খুললাম আমি, ঘর খুলে পাখা চালিয়ে বসতে দিলুম সোফায়। রান্না করবার মেয়ে-ছেলেটা আর একটা ছোকরা চাকর থাকে, কে জানে কোথায় গেছে। হয়তো দু'জনে মিলে সিনেমায় গেছে, আগেও গেছে কয়েকবার। সলিলের কাছে বিব্রত হলুম একটু। সলিল ব্যাপারটা বুঝতে পেরে হাসি দিয়ে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করলো। বড় ছটফট করতে লাগলো, একবার বলে উঠলো ; আপনি প্রত্যুম্নের স্ত্রীর ক্লাসমেট। প্রত্যুম্ন একদিন বলছিল ; ওর স্ত্রীর সঙ্গে নাকি আপনার ঘনিষ্ঠতা ছিল খুবই।

মনে মনে আমি একটু চমকে উঠলুম, বাইরে স্থির থেকে শুধু হেসে টেবিলের সামনে কিছু ম্যাগাজিন ঘাঁটছিলুম অন্যমনস্কভাবে। এমনিভাবে কিছুক্ষণ থাকবার পর সলিল নিজেই উঠে পড়ল, বললো ; আমাকে আজ একটু মুক্ত হতে হবে। আমি আজ মদ খাবো। আর হৈহৈ করবো। আমি স্থির দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে চুপ করে রইলুম, শুধু বললুম ; যাবেনই !

সলিল আমার দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে বেরিয়ে গেল দরজায় ধাক্কা খেয়ে।

চোখ বুজে ভাবছি কী করা যায়, কীইবা করবার আছে, আপিশের কাজ আমি বাড়িতে নিয়ে আসি না, ওই কাজ ওখানেই চুকিয়ে দিয়ে আসি। প্রত্যুম্নের বাবার কথা মনে হলো, সত্যিতো,

দেশের ঋণতো আমি শোধ করছি না। কারও ঋণই নয়, বাবা ও মায়ের ঋণই কি শোধ করতে পারি, মনের মধ্যে কী আমার বাবা-মা জেগে আছে, কখনো যে তাদের জন্যে কিছু করবো, তারা মরে গেছে, মৃত লোকের ছবি দেখতে নেই, কিন্তু তবু এই ঘর বাড়ি, দেয়ালে তাদের ছবি এবং আমার এই শরীরটা—কিন্তু তারা নেই, তারা মৃত, মৃতের ঋণ কি শোধ করছি আমি আমার জীবন দিয়ে। প্রদ্যুম্ন কি দেশের ঋণ শোধ করতে পারছে, সে তো জেলাশাসক, দেশের হৃদ্‌পদ্মকে কি সে উদ্ধার করতে পারে, দেশের নিহিত শক্তিকে কি সে উদ্‌ঘাটিত করতে পারে তার কর্মপ্রচেষ্টায় ও আন্তরিকতায়, দেশের পণ্যদ্রব্য প্রদ্যুম্ন নিজেও, কিন্তু সেই পণ্যদ্রব্য দিয়ে সে দেশের দারিদ্র্য কি দূর করতে পারে, পণ্যদ্রব্যের উৎপাদন সে কি বাড়াতে পারে; প্রদ্যুম্ন নিজেও তো নিজের কুণ্ডের মধ্যে পাকিয়ে আছে, আমি কি সেইখানেও অধিকারের সীমা লঙ্ঘন করি নি, হয়তো সুলতার জন্যেই প্রদ্যুম্ন নিজেকে যুক্ত করতে পারে নি, দেশের সঙ্গে যোগ তার সুস্পষ্ট হয় নি, শুধু না-হওয়ার দিকটাকে দেখে তাকে বদ্ধ করতে চেয়েছি। এর জন্যে আমিই দায়ী। অপরাধবোধ আমাকে কুরে খায় প্রতিদিন।

দরজায় এমন সময় কড়া নড়ে উঠলো। বাইরে গাড়ির হর্ন। দরজা খুলতেই দেখি সুলতা দাঁড়িয়ে। লাল শাড়ি লাল ব্লাউজ, পায়ে লাল চটি, কপালে সিঁদুরের বড়ো টিপ, সিঁথির দুপাশের চুলে বোঝাই-করা সিন্দূরের পাহাড়। এতো লালের মধ্যে সুলতার মুখটা হারিয়ে গেছে, আমার কাছে যেন আগুনের শিখা জ্বলছে, তার কোনো অবয়ব অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নির্দিষ্ট রূপ নেই, একটা বিমূর্ত শিখার উষ্ণতা আমাকে স্পর্শ করছে ঘন নিবিড়ভাবে। আমাকে উদ্দেশ করে বললো; তুমি কী আমাকে দাঁড় করিয়ে রাখবে বাইরে বাসু, ভেতরে ঢুকতে দেবে না?

চমকে বললুম; তা কেন? এসো, ভেতরে এসো। তোমাকে দেখছিলুম, রক্তশিখার মতো জ্বলছ কেন সুলতা?

—জ্বলছি, জ্বলছি বাসু? তুমি কি দেখতে পাও না?

না, এর বেশি কথা বলা উচিত নয়, সুলতা কি করে বসে বুঝতে পারি না। ঘরে ঢুকতে ঢুকতে জিগ্যেস করলুম; তোমার স্বামী প্রদ্যুম্ন

কোথায় ? তাকে নিয়ে এলে না কেন ?

—ওকে বলেছিলুম, এলো না। কেন, তোমার আপত্তি আছে আমার একা আসবার ?

আমি হেসে চুপ করে রইলুম ওর দিকে তাকিয়ে। সহসা সুলতা সোফা থেকে উঠে আমার হাত দুটো জড়িয়ে ধরে আবেগে বলে উঠলো ; বাসু, তোমাকে আমার ওখেনে যেতেই হবে।

—আমি কি করে তোমার ওখেনে যাই

—কেন, আমার অধিকার নেই ?

—নিশ্চয় আছে,

—তুমি যাবে না ? যাবে না বাসু ? তুমি না গেলে আমি মাথা খুঁড়ে মরবো এখানে তোমার সামনে।

—কিন্তু আমি গিয়ে কী করবো ওখেনে ?

—কী করবে ? কিছুই তো তোমার করবার নেই, তুমি তো দর্শকমাত্র।

বুকের ভেতরটা ধক করে উঠলো, সত্যি কী শুধু আমি দর্শক, কেন, চোখে দেখবার কী আনন্দ আমার নিজের মধ্যে লুকিয়ে আছে, দেখবার আনন্দের মধ্যেই কি আমার জীবন।—বাসু ? ! মা, তুমি অমনভাবে তাকিয়ো না। সুলতা খাটের স্ট্যাণ্ডটা ধরে দাঁড়িয়ে আছে মাথা হেলিয়ে, ইচ্ছে হলো পাশে বসাই, না, ওকে দাঁড়িয়ে থাকতেই দিলুম, আর দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সত্যি ওকে ভালো লাগছিল, ওর দিকে তাকিয়ে আছি নীরবে, ঘরের এলার্ম ঘড়িটা টকটক করে বাজছে, আমি ওর হাত ধরে বললুম ; সোফায় বসো।

—তুমি কি যাবে না ?

ওর চোখে চোখ রেখে বললুম ; বসো সুলতা, যাবো।

সুলতা আনন্দে নেচে উঠলো সারা শরীরে, ওর চোখে নক্ষত্রের দ্যুতি ছড়িয়ে পড়ল বিরাট লাল আকাশের পটভূমিতে। দাঁড়িয়ে উঠে ছুটে আমার কাছে আসতে চাইলো, আমি সরে দাঁড়ালুম একটু, একি ব্যাকুল আকুলতার ঝর্না, কিন্তু আমার মধ্যে স্রোত নেই কেন ?

গুটি গুটি পায়ে রান্নার মেয়েছেলেটি ঢুকলো, আমাদের দু'জনকে

এমনভাবে বসে থাকতে দেখে অবাক চোখে তাকালো একটু, তারপর রান্নাঘরে চলে গেল, এর কয়েক মিনিট বাদেই ছোকরা চাকরটা ঢুকলো ভয়ে ভয়ে, লঘু পায়ে, দরজার কাছে এসে দাঁড়াল মাথা নিচু করে। বাইরে গিয়ে কিছু মিষ্টি ও চায়ের কথা বললুম ওকে।

সুলতা এককোঁটা জলও খেলো না, ওর উপস্থিতি আর আমি চাইছি না ঝি-চাকরদের সামনে, এটাই হয়তো ও বুঝেছে। আবার আমার হাত দুটো ধরে মিনতি জানিয়ে চলে গেল গাড়িতে উঠে।

আমার এখন বিদায়ের পালা, সুলতা ঠিকই ধরেছে, আমি দর্শক, পথ চলতে চলতে দেখতেই আমার আনন্দ, আমি কিছু দিতে চাই না, দেবার মতো শক্তি ও নেবার মতো আসক্তি আমার নেই, কিন্তু আমার মনের মধ্যে এক অফুরন্ত বিশ্বাস আছে, এই বিশ্বাস আমাকে অপেক্ষা করতে শেখায়! মা হারিয়েছি, বাবা হারিয়েছি, তবুও জানি আমার কিছুই হারায় নি, আমি চারদিক দেখছি, জানছি, পাচ্ছি, হচ্ছি, তারপর এগোবার জন্যে আমার মনে আকাঙ্ক্ষা জাগে, আমার শৈশবের কান্নার স্মৃতিতে ফুল ফোটে, স্মৃতি বলতে কি কিছু আছে, তবু ফুলের গন্ধের অস্পষ্টতার মতো রহস্য কেমন আমার বুকের মধ্যে ঘুমিয়ে থাকে সব সময়; সংগীত ভালোবাসা, গান, ভালোবাসলেই কি ভালোবাসা আসে, এ ভালোবাসার স্বরূপ কী, ভালোবাসায় গানের আলো জাগে, মাঝে মাঝে আমার ঘুম পায়, ঘুমের মধ্যে স্বপ্নে কতো পৃথিবীর শিল্প জাগে, সেই শিল্পের মধ্যে সুলতা একা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমার দিকে তাকিয়ে হাসে, আমার বুকের নিভৃত বিন্দুর মধ্যে অতল গহ্বরে, না এ পাতাল নয়, অতল গহ্বরের স্থির বিন্দু, ব্যক্ত ও অব্যক্তের মধ্যে এই বিন্দু অনন্ত কোটি সূর্যের মহা আলোর শক্তি নিয়ে জেগে আছে, নদী পূর্ণ হয়ে উঠছে, পূর্ণ নদীর ছলাৎ ছলাৎ শব্দে ধ্বনি জাগছে, সে সমুদ্রের দিকে এগোচ্ছে, সমুদ্রে প্রবেশ করছে, সমুদ্র পূর্ণ, পরিপূর্ণ শান্তি, শ্রাবণের পূর্ণিমার আলো পড়ছে ওর জলে, দিগন্ত আকাশের স্নিগ্ধতায় অনাদি আলোর ভালোবাসা আমার বুকের মধ্যে সমস্ত ভুবনের আভা আনন্দ হয়ে জাগছে, সমস্ত স্তব্ধ হয়ে গেলেও জলের কাঁপনের গান কল্লোলিত, দিবসরাত্রি মেঘবিদ্যুৎ সুখদুঃখ আমি জগৎ সাগর

ও নদীর মতো মিলে গেল নক্ষত্রপ্রদীপের আলো জ্বালিয়ে। এই কী মৃত্যু, এই কী ভালোবাসা, যেখানে সবকিছু একাকার হয়ে আছে গানের সুরের দেহ ধরবার জন্যে। বিন্দুর মধ্যে আমি ডুবে আছি, কিসের আহ্বানে আমার মধ্যে আলিঙ্গনের আনন্দচুম্বনের দীপ্তি জাগে, কোন্ নৈবেদ্যে আমি আমার ধ্যানকে জপে পরিণত করে 'বিন্দুর মধ্যে মিলে যাবো! আমি মিলে যেতে পারি না, বিন্দু আমাকে জাগিয়ে রাখে; সেই বিন্দুর মধ্যে সুলতা লাল শিখার মতো জ্বলে ওঠে, তারপর সেখানে মিশে যায়, এবং শেষে আমাকে, আমার জগৎকে ব্যাকুল করে দেয়, তারই চঞ্চলতায় এদিক থেকে ওদিকে ঘুরে বেড়াই এখন, আমি যে তারি কাছে যাই, সুলতারই কাছে।

আমার ভাবনায় সুলতা আমার সঙ্গে এক হয়ে আছে, কোনো কারণ নয়, কারণ মানেই পরিণতি, কার্য, অর্থাৎ আলাদা। আর আলাদা হলে তো ভেদ অবশ্যম্ভাবী। আমার চিন্তা ভাবনা অনুভবে সে নিয়তই হয়ে উঠছে রোজ রোজ তিল তিল করে।

অনিরুদ্ধকে দিয়ে ভিসা করালুম তাড়াতাড়ি, সলিলও কিছু সাহায্য করলো আমাকে, ও এখন আরো নষ্ট হতে চলেছে। আপিশের সকলকে বিদায় জানিয়ে দমদম থেকে প্লেনে উঠলুম, মনে হলো সুলতা আমাকে হাত নাড়িয়ে বিদায় জানালো, তারপর ওপর থেকে নদীপথ শরীরের শিরার মতো চোখে জেগে উঠলো, প্লেনটা যখন আকাশের মেঘের মধ্যে ঢুকছে সুলতা আমার বুকের বিন্দুর মাঝখানে বসে হাসছে।

হারানো অন্ধকারের অন্বেষণ

জনতা মুখ ব্যাদান করলো কুমিরের মতো, তাকে খুঁচিয়ে দিলো মন্ত্রীর ক্রোধের বর্শা, বর্শার ঘায়ে পেট ফুলতেই প্রদ্যুম্নকে তার মধ্যে আশ্রয় নিতে হলো। এর শাস্তিস্বরূপ তাকে ঘরের বাইরে প্রকৃতির বিস্তীর্ণ লীলায় তাকে আর ঘুরতে হয় না, রাইটার্সের ছোট ঘরের অন্ধকারে দরজা জানালা এঁটে তাকে সব সময় থাকতে হয়। পায়ের শব্দের হা-হা চিৎকার, দরজার ক্যাঁচক্যাঁচানি, পাখার ফিস্‌ফিসানি,

কাঁপানো আলো, স্তব্ধ শয়তানির পাগল হাসি, তোশামোদের ঘোলাজল, গ্যাঁজলা-ওঠা চাটুকারিতা সব কিছুকে সহ্য করতে হয়, অথর্ব ও বৃদ্ধ, আজ ভীষণ দলনেতা, এরা নাকি জনগণের মনের নাড়িনক্ষত্র জানে, তাই অভিজ্ঞতার বিদ্যা পলিসির ধারায় বয়ে চলে। বাইরের সমস্ত বৈচিত্র্য ঘরটার মধ্যে স্মৃতির হাওয়া নিয়ে ঘুরে বেড়ায়; কড়িকাঠে, সিলিঙে, শাদা রঙে, জানালায়, চেয়ারে, টেবিলে সর্বত্র অতীত স্মৃতি পাহারাদারের মতো দাঁড়িয়ে হাসছে তার সামনে।

এখানেও মুক্তি নেই, ফাইল ঘাটতে বিপদ, সিদ্ধান্ত-মাফিক কাজ করা মুশকিল। বহু জায়গা থেকে বহু রকম লোক তদারকি করে, পরামর্শ দেয়, ভয় দেখায়, এবং জননেতার কাছে গিয়ে লাগায়। গণেশ ঠাকুরের কাছে ইঁদুর সাজতে হয়। অধীনস্থ কর্মচারীরা শাদা আরশুলার শুঁড় নাড়ে। বহু রকম লোকের আনাগোনায় অনেকের বাড়িতে যাতায়াত করতে হয়। তখন শাড়ির ভেতরের রঙিন পালকের শ্বেত গন্ধ মাঝে মাঝে উন্মাদনা জাগায়, আর্দ্র ঠোঁটের রক্তিমাভ রেখাময় মোহ, কুঞ্চিত ভাঁজ, শুকনো শাদা চুল, পাউডারে-ঘসা গালের পেলব ধূসরতা, বেদনার দুল, বডিসের টেপ, বুকের কাঁপন সব যেন কেমন লাগে, তার চারদিকে ঘিরে একটা ফুলের জলসার রক্ত মেজাজ চড়ে যায়, প্রদ্যুম্ন স্থির মস্তিষ্কে চারদিকে তাকায়, তাদের সঙ্গে হাসে, একটু বিয়ার টানে, সিগারেটের ধোঁয়া ওড়ায়, দু'একটা কথা বলে, তারপর আপন সত্তার কাছে অপরাধীর মতো ভয়ে পালিয়ে আসে, কলকাতার সরকারি ফ্ল্যাটে লাইট নিভিয়ে চুপটি করে শুয়ে থাকে। এক স্থূলতাই বহু স্থূলতা টুকরো হয়ে গিয়ে ধরতে চায় যেন, ভয়টা সেখানেই প্রদ্যুম্নের।

পাকিস্তানের যুদ্ধের বিভীষিকা বাঙালি জীবনে একবার জেগে উঠেছিল চমকানো ভয়ের মতো, বর্ডারে মিলিটারি ছেয়ে আছে, এর মধ্যে সীমান্তের লোকেরা আসে যায়, মরে, রাত্রির অন্ধকারে স্মাগ্‌ল করে, ধরা পড়ে, ছাড়া পায়। যুদ্ধ লাগে রাজনৈতিক দাবার চালে। ভেতর থেকে সাধারণের দৃষ্টিকে সীমান্তে নিয়ে গিয়ে উলঙ্গ করে বারুদের সামনে ছেড়ে দেয়, বাইরের বিদ্বেষে নিজেদের গদি ঠিক রাখতে পারার কৌশলেই যুদ্ধের হিড়িক। স্বদেশের গৌরব

অর্থের ও ক্ষমতার ; অর্থ ও ক্ষমতা স্থির ভূমি পেলে দেশের গৌরব এমনিই বাড়ে। নিজেকে বাঁচাবার জন্যে, মানুষকে রক্ষা করবার হিতৈষণায় যুদ্ধের প্রস্তুতি প্রদ্যুম্নের কাছে হাস্যকর লাগে। শ্লোগানের রঙিন বেলুন আকাশে উঠলে মরা চাঁদের হৃদয়ও কাঁপে। জেলা শাসক হিশেবে সাঁজোয়া বাহিনীর মধ্য দিয়ে যেতে যেতে বেশ একটা বীরত্ব লেগেছিল ওর হৃদয়ে, যেন বাঙালি প্রথম যুদ্ধ করছে, এই যুদ্ধে সে-ও অংশীদার। তারপর তার হাসি পেয়েছিল, কৌতুক বোধ করেছিল, বোধ করেছিল এই ভেবে যুদ্ধ ও শান্তি আমাদের নিশ্বাস-প্রশ্বাসের মতো, গতি ও স্থিতি একসঙ্গে জড়িয়েই দেশকাল চলছে, তারই ধুলো উড়ছে, ফুল ফুটছে হৃদয়ে। এবং মুদ্রাস্ফীতি তৈরি করে রাজস্ব ও জাতীয় আয় যদি অফুরন্ত বাড়িয়ে তোলা যায় কর বসিয়ে, মূল্য নিয়ন্ত্রণ করে, ধার নিয়ে, রেশন করে, তাহলে রাজকোষ ঠিক থাকবে, ক্রয়ক্ষমতা বাড়বে, শাসনের পতাকা উড়বে আরো সুন্দরভাবে। দারিদ্র্যের মধ্যেই দলীয় সৌভাগ্যের সূর্যের রশ্মি এক হয়ে জ্বলবে আকাশের নীচে। শরতের হিমেল আলোয় কাশের শাদায় বন্দুক কেমন উঁচু হয়ে আছে বারুদের গন্ধে। সীমান্তের নদীর ওপর দিয়ে রাত্রের অন্ধকারে সামান্য দূরত্বে হিন্দু-মুসলমান এক স্রোতে ভাসছে। কিন্তু নদীর দুই ধারে বন্দুকের সঙ্গীন উঁচানো নদীর জল ঢেকে রেখেছে। দুপক্ষেরই লোভ ভাসছে। ইসলামের বিশ্বজোড়া ধর্মীয় অধিকার হয়তো একদিন গিলে ফেলবে, না পারবে না, আধুনিক বিজ্ঞানের সঙ্গে সংস্কারের ডগমা তাল রাখতে পারছে না। তাই ইংরেজের কাছে ওদের হার হয়েছিল। বাঁচতে হলে আধুনিক হতে হবে বিজ্ঞানকে নিয়ে। কিন্তু স্থূলতাকে নিয়ে প্রদ্যুম্নের হৃদয়ে শুধু যুদ্ধই ঘটেছে, রক্তপাতের মধ্যে দিয়ে শান্তি পায় নি কখনো সে, তাই সমাজের সঙ্গে মানুষের সঙ্গে মিলনে তার বোধ ও উপলব্ধি সূক্ষ্ম ও কমনীয় হয় নি। সে-ও তো মানুষকে চায়, কিন্তু যুদ্ধের হিড়িক যদি লেগেই থাকে সারাক্ষণ এবং ভেতরে স্বার্থের জন্য দাঙ্গার হাঙ্গামা, তাহলে ফুল ফুটবে কখন সকালের আলোয়, তাই সে ক্ষুব্ধ ও ক্ষোভিত, আলোড়িত। যুদ্ধের মতোই অহংকার ও মারবার বৃত্তি ওর মধ্যে জেগে আছে, ভুলে গেছে অন্যদের, যেমন একটা সোলজার ভুলে

যায় কাঁধে বন্দুক নিয়ে সীমান্তে শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধে। তবু রাত্রির আকাশে শরতের পূর্ণিমায় সীমান্তের নদীর ঢেউএর বেদনার আনন্দ ওর বুকে এসে লাগে শান্ত মুহূর্তের ক্ষণে ; তারই স্মৃতি, তারই কান্নার বাতাস।

সুলতার মৃত্যুর পর সে আর বাবার কাছে ফিরে যায় নি। বাবা মা রক্তের স্মৃতির মধ্যে থাকলেও নারীর প্রতি আকর্ষণ আমাদের সত্তাকে আমূল আলোড়িত করে। সেখানে তখন অন্য কারো উপস্থিতি আমরা ভুলে যাই। আলাদা বাসা করেছে সে, মাঝে মাঝে গিয়ে দেখা করে এসেছে। পঙ্গু বাবা কর্মের উপদেশ দিয়েছেন, বলেছেন, কর্মেই মুক্তি। প্রদ্যুম্ন কোনো কথা বলে নি, আপন মনে চলে এসেছে। 'কি জানি, না, এটা ঠিক কিনা জানি না, তবু মনে হচ্ছে, সত্যি মনে হচ্ছে, সুলতা মরে গিয়ে আমার শরীরের গুণ ও উপাদানের মধ্যে এসে প্রকৃত বাসা নিয়েছে, আমার মোহ ক্রোধ, ভালোবাসা কামনার মধ্যে তাকে পাচ্ছি, ওর প্রকৃতি আমার প্রকৃতির মধ্যে মিশে গেছে, তাই যন্ত্রণায় আমি কাঁপছি, দুলছি ভাসছি, সমস্ত শরীরের মধ্যে সুলতার শরীরের সাড়া পাচ্ছি। আমার ইন্দ্রিয়বেদনার মধ্যে সুলতা যেন চুপটি করে বাসা নিয়েছে। তাকে আমি বন্দী করেছি, বদ্ধ ঘরের অন্ধকারে তাকে নগ্ন করে আলোয় পূজা করছি। যতো দিন যাচ্ছে, ততোই মনে হচ্ছে, আমার আকাঙ্ক্ষায় পদ্মের ডাঁটার সঙ্গে বাইরের ইন্দ্রিয়বেদ্য বিকারজনিত গুণের একটা যোগসাধন হচ্ছে, মিলন ঘটছে, আলিঙ্গন করছে, যাকে আমি পাই নি, পেতে পারি নি, সে যেন নড়ছে, দুলছে, যাকে নিয়ে আমার জ্বালা, যন্ত্রণা হতাশা পাপ, অপরাধ, যাকে পেলে আমার তীব্র আনন্দ, নিবিড় পুলক, এই ইন্দ্রিয়চেতনার সঙ্গে স্তব্ধ গোলাপের হাসির জ্যোতির মিলন ঘটছে। আমি জানি, আমি যখন কিছু চাই না, তখনও আমার শরীর চায়, শরীরের এই চাওয়ার মধ্যেই বিশ্বের যোগ রয়েছে, এমনি করেই দুয়ে দুয়ে মিলন ঘটে, পরিচয় ব্যাপ্ত হয়। না, না, এ আমার মনের ভয়, এ আমার সান্ত্বনা, যার সঙ্গে বাস্তবের কোনো যোগ নেই, একটা মিথ্ তৈরি করেছি, তার মধ্যে চুপটি করে থাকতে চাইচি, আসলে বিরোধ পাচ্ছি না বলেই, একটা শীতল আনন্দের প্রবাহ চারদিকে বয়ে চলেছে। বাস্তব এতো সরল নয়, যদি হতো, সুলতা মরতো

না। না, সুলতা বেঁচে থাকলেই ভালো হতো, উপাদানের বিভেদে লড়াই জমতো ভালো, আমি লড়াই করতে ভালোবাসি। তবু যেন মনে হচ্ছে সুলতা আমার মধ্যে এসেছে, আমি যখন পাশ ফিরে শুয়ে ঘুমোই, সুলতাও একসঙ্গে শুয়ে থাকে, নিশ্বাস ফেলে, দুলে ওঠে। পুরুষের হয়তো এই মুক্তি। কে ?'

'প্রদ্যুম্ন, তুমি মিথ্যেই ভাবছ, যতোক্ষণ পাই না, ততোক্ষণ কি পাই নি এ সম্বন্ধে একটা মোহ, একটা সত্যবুদ্ধি, আকাঙ্ক্ষা ঠিক থাকে, কিন্তু যখন পাই, তখন সব একাকার হয়ে যায়, জানি না কী চাই, তবু তার দিকেই এগিয়ে যাই। আমার সাঁতার দেওয়া ছাড়া আর কিছুই থাকে না। তুমি আমাকে পেতে পারো নি ; আমি, আমি বাসুদেবকে চেয়েছি, তাই আমাদের ক্ষেত্রে লক্ষ্য একটা স্থির ছিল ; কারণ এ সবই আমাদের রক্তের চিন্তা, মাথার ভাবনা। পেলে পরেই নাড়া খেয়ে অন্য পথ ধরে, তখন শান্ত হবার জন্যে বারংবার ঘুরতে হয়।'

বাসুদেব : আমি আমার মধ্যেই সব পেয়েছি, তবু কেন যে তোমার কাছে গিয়েছিলাম, এ কী রকম দুর্বলতা, একি বিচ্ছিন্ন হবার জন্যে বাসনা ? না, আজ আমি মৃত্যুশয্যায়, প্রদ্যুম্নকে দেখবার ইচ্ছে হচ্ছে, সে কেমন আছে ? সে আমাকে ভীরু কাপুরুষ ভাবে, ভয়ে পালিয়ে এসেছি, জোর করে তোমাকে টেনে নিতে পারি নি বলে তুমি অভিযোগ করেছ, প্রদ্যুম্ন উপহাস করেছে। সত্যি, জোর করব'র কোনো মানে হয় না, কারণ আমি সব পেয়েছি। পাই নি বলেই পেয়েছি, পেলে পরেই তোমাকে আমার হারাতে হতো, অন্যতর সন্ধানে বেরুতে হতো, ব্যর্থতাও একরকম পাওয়া, নিঃস্ব রিক্ততার মধ্যেও পাওয়া লুকিয়ে আছে ; তবে এই পাওয়াটা দুজনের জানা চাই। সুলতা তুমি ভালো থেকো। আমি যাচ্ছি। শরীরের বিচ্ছেদ কেন, আমার মধ্যে এক দুরারোগ্য অস্পৃশ্য ক্ষয় নিয়ত মৃত্যুর দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে, লোকে আমাকে দেখতে আসে না। কিছুই বুঝিনা, কতোটুকু বুঝেছি। শুধু গ্রীষ্মের সকালের হাওয়ার মতো এক বোধ কেঁপে যায় আমার সারা হৃদয়ে। কে প্রতিশোধ নিচ্ছে।

—শুনছ তুমি, ছেলের আমি আবার বিয়ে দেবো। কী দোষ তার, শক্তি না থাকলে ও কাজ করবে কী? পুরুষ মানুষকে কর্ম করতে হবে। কী বলছ তুমি? কথা বলছ না কেন? এ কি কাঁদছ! নাঃ। সুলতার জন্যে কাঁদছ? না, প্রদ্যুম্নের দুঃখের জন্যে কাঁদছ? নিশ্চয় সুলতাকে তুমি ভালোবাসতে, শত হলেও মেয়ে তো, তোমার রহস্যের সঙ্গে ওর রহস্য হয়তো কোথাও গাঁটছড়া বেঁধেছিল। সবাই তোমরা এক।'

'না না, এমনিভাবেই কি আমার দিন কাটবে? এমনি স্বপ্নের মিথ্যা ঘোরে, বেদনার হতাশায়, তুমি কী করতে চাও, কি কাজ করতে চাও, না উঠে আমাকে বসতে হবে। পথ চলতে হবে। সুলতা, তোমাকে পাবার ব্যর্থতা আমার পথ চলাকে পর্যন্ত থামিয়ে দিয়েছে, আমি পথ চলতে পারছি না, হাঁটতে পারছি না, দাঁড়াতে পারছি না, তোমার মধ্যেই আমার বিশ্বকে দেখতে চেয়েছিলুম, তোমার রক্তের মধ্যে প্রবেশ করে তোমার রক্তে গঠিত একটি বিশ্বকে আপন করে নিতে চেয়েছিলুম, কারণ প্রত্যেকেই আমরা আমাদের মধ্যে একটি বিশ্ব গড়ে তুলি অভিজ্ঞতায়, রক্তে, শরীরে, অস্থিমজ্জায়; ভালোবাসায় তাকে পেতে হয়। না, সব পাওয়া যায় না, পাওয়া যায় না বলেই রহস্য থেকে যায়, বাধা থেকে যায়, কখন কোথায় কেমনভাবে মিল হবে? হবে কিনা কে বলতে পারে, হতে পারে না, তাই বিরোধ, দ্বন্দ্ব, পাপ কাজ করে, ভালোবাসা যেখানে গভীর নিবিড় একাত্ম, সেইখানেই দ্বন্দ্ব বিরোধ, পাপ থাকে, কারণ রোমকূপে রোমকূপে মিলন হয় না। সেই দাঁত-খোলা বন্ধুর কাছে শুনেছিলুম, রাধা নাকি মিলনের বাধা হবে বলে হাতের আঙটি খুলে ফেলেছিল, আমাদের এই আঙটি কি আমরা খুলতে পারি? আমরা আঙটির মধ্যে ঢুকে বসে আছি।'

একদিন বিকেলবেলা প্রদ্যুম্ন বসে আছে, হঠাৎ দরজা ঠেলে দুজন প্রবেশ করলো, পুরুষটির চেহারা রুক্ষ, মাথার চুল উস্‌কোখুশকো, মুখে পাইপ, পরনে ট্রাউজার, গায়ে জ্যাবড়া রঙের বুশ সার্ট, তার সঙ্গে একটি মহিলা, আধুনিক ফ্যাশনের জামাকাপড় পরনে, বডিসের সঙ্গে ব্লাউজটা শুধু লেগে আছে, তার আর সব খোলা, পাছার ওপরে প্যান্টি জড়িয়ে

শাড়ি পরনে, উন্মুক্ত বিশাল নাভি। প্রথমে চিনতে পারে নি, হ্যাঁ, সেই উগ্র মার্ক্সিস্ট সুনীথ। যে নাকি প্রত্যুম্নকে বারবার বুর্জোয়া বলে গালাগাল করতো, তার মাথায় টোকা দিয়ে বলতো ; বুর্জোয়া বুদ্ধির ডিপো। কিন্তু এই স্ত্রীকে তো সে দেখে নি, সুনীথের চেয়ে একটু বয়স্ক মনে হচ্ছে, কিন্তু রক্ত ঠোঁটে, নগ্ন বাহুতে, উজ্জ্বল বাসে, গৌরতনুর নিটোলতায় বব্‌ চুলের আঁধারে সব লুকিয়ে রেখেছে। ঢুকেই প্রত্যুম্নকে বললো ; 'কি হে, তুমি এসেছো, অথচ আমাকে জানাও নি? রিনির কথায় তোমাকে দেখতে এলাম।' প্রত্যুম্ন হাত তুলে নমস্কার জানালো, ভদ্রমহিলা হাসলেন, সুন্দর হাসিতে শাদা দাঁতগুলি অর্ধ-উন্মুক্ত আলো হয়ে ঠোঁট ধুয়ে দিলো, গায়ের মাংসের রঙের সঙ্গে শাদা পাথরের জৌলুশ অপূর্ব মানিয়েছে। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই প্রত্যুম্ন হেওয়ার্ডের গন্ধ পেলো। প্রত্যুম্ন কিছু মনে করলো না, ভেবে নিলো, স্ত্রীপুরুষ এখন একসঙ্গে মিলে কিছু মদ না খেলে আপাঙ্‌ক্তেয় হয়ে যায় অভিজাত সমাজে।

সুনীথ বললো ; 'প্রত্যুম্ন, তোমাকে আমাদের বাড়ি যেতে হবে। কাল আমাদের ম্যারেজ এ্যানিভার্সারি। তুমি যখন কলকাতায় আছো তখন অবশ্যই যাবে। শত হলেও তুমি আমার বুর্জোয়া বন্ধু, এসব ব্যাপারে বুর্জোয়া বন্ধুর থাকা দরকার। কারণ বিয়েটা বুর্জোয়া মনোভাবের, এসব রিনিরই কাণ্ড। ওর কথায় আমাকে সায় দিতে হচ্ছে।'

—কেন, তোমার মত নেই?

—না থাকবে কেন? তবে অনুষ্ঠানে আমার ইচ্ছে নেই। টাকা পয়সার ব্যাপারটা আছে তো!

—দেখেছেন আপনার বন্ধুর ব্যাপারটা ; আপনি কিন্তু অবশ্যই যাবেন। ওর মুখে আপনার অনেক সুখ্যাতি শুনেছি।'

সুনীথ হঠাৎ বলে উঠলো ; 'তোমার স্ত্রী সুলতা হঠাৎ সুইসাইড করলো কেন প্রত্যুম্ন, তুমি কি টর্চার করতে? না, মিল ছিল না? ঝগড়া হতো, তা সেপারেশন হলেই তো হতো, রিনি তো এই কারণেই জগদীশ এস্‌.ডি.ও.কে ছেড়ে আমার কাছে এসেছে। তোমার

স্ত্রীর ব্যাপারটা যখন শুনলুম, সত্যি বড়ো দুঃখ পেয়েছিলুম, এ যুগে এমন হতে পারে! যাক্, তুমি কিন্তু অবশ্যই আসবে কাল। আরো কয়েকজন বন্ধুবান্ধব আসছেন, কয়েকজন মন্ত্রীও আসছেন।'

প্রত্যুম্ন কোনো কথা বললো না, যাবার সময় আর একবার রিনি অনুরোধ জানিয়ে হাসি ছাড়িয়ে দরজা বন্ধ করে চলে গেল। প্রত্যুম্নের মনে হলো, সত্যি দেখতে অপূর্ব। ওর সমস্ত বেশ ও বাসের মধ্যে মোহ জড়িয়ে রয়েছে, মোহের অন্তরালের অন্তরে এক ঘূর্ণি হাওয়া দুরন্ত বেগে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাতেই ওকে সুন্দর লাগছে। প্রত্যুম্ন আগেই অন্য বন্ধুর কাছে শুনেছিল, রিনি আগে দুজন স্বামীকে পরিত্যাগ করেছে, সুনীথ ওর তৃতীয় স্বামী। 'প্রত্যুম্ন, তুমি দেখতে পাচ্ছো? দেখতে পাচ্ছো রিনি পথে ছুটে চলেছে, ওর বুকের গভীরে যে নীলপদ্ম স্তব্ধ হয়েছিল, ওর প্রথম স্বামী অভীক প্রেমে নাড়িয়ে দিয়েছিল, ওদের প্রথম প্রেমের নিবিড় স্পর্শে তাকে আর রিনি কিছুতেই শান্ত করতে পারছে না, নদীর স্রোতে ভেসে যাচ্ছে, জল নাড়াচ্ছে, মাছের মতো খেলছে, কে তাকে থামাতে পারে তারি জন্যে সে খুঁজছে। যদি অভীককে নিয়ে থাকত, তাহলে বিরোধ পাপ এসে বাসা বাঁধতো।' 'না না, এ আমারি মনের প্রতিধ্বনি' প্রত্যুম্ন জানালা খুলে তারাভরা আকাশের দিকে তাকিয়ে রইল।

সুনীথের বাড়ি থেকে ফেরবার সময় প্রত্যুম্নের সারা শরীরে অসহ্য বেদনা, যন্ত্রণা, আনন্দ, আরাম। পাপের তীব্র নিবিড়তা ওকে আনন্দে জড়িয়ে ধরেছে। সুনীথের স্ত্রী রিনি প্রায় নগ্নিকা, সুনীথ তার কোমর ধরে সকলের কাছে আসছে, মদের পাত্র এগিয়ে দিচ্ছে; জোড়া জোড়া যারা এসেছে, তারাও বিভ্রান্ত, হতবাক্; সকলেই হাসছে, শরীর থেকে বেশবাস স্খলিত হয়ে যাচ্ছে। এক সেক্রেটারির মেয়ে প্রত্যুম্নের কাছে বসেছিল, আগে দু'একবার দেখা হয়েছে, লাস্যে হাস্যে তাকে অভ্যর্থনা করেছে, তাকে বেড়াতে যেতে আমন্ত্রণ করেছে, প্রত্যুম্ন যায় নি, আপন মনে বিষাদে একা কাটিয়েছে, সেই প্রমাই আজ এই পানোৎসবে প্রত্যুম্নের গায়ে একেবারে এলিয়ে পড়লো, প্রত্যুম্ন সরে বসলো একটু, প্রমা খিল্ খিল্ করে হাসলো, বললো; 'ভয় নেই, আপনাকে নিয়ে পালিয়ে যাবো

না, না যেতে পারলে আত্মহত্যা করবো না।' প্রদ্যুম্ন আঁতকে উঠলো, ভেতরে চোখ তুলে তাকালো, প্রমা হাসছে, তখনো ওর ডান হাতটা প্রদ্যুম্নের ডান উরুর ওপরে, সকলেই ব্যস্ত, ব্যগ্র সুনীথ রিনিকে নিয়ে ব্যস্ত, রিনি সকলকে অভ্যর্থনা করছে, হাসছে, অথচ ভেতরে ভেতরে কী যেন খুঁজছে, মাঝে মাঝে চোখ বন্ধ করছে, নেল পালিশ-করা শাদা নখ দিয়ে চিবুক ঠোঁট বুলিয়ে নিচ্ছে, অন্যমনস্ক হয়ে ঠোঁট দুটো কুঞ্চিত করছে। মন্ত্রীরা মদ গিলে ঢলে পড়েছে সোফায়, তার মধ্যে কেউ কেউ মাতাল পায়ে গাড়ি করে বাড়ি ফিরছে, প্রমা ভীষণভাবে হাসছে, প্রদ্যুম্ন বুঝতে পারছে না কী করবে, প্রমাকে নিয়ে এখনি সে বাইরে বেরিয়ে যেতে পারে, অথবা ঝট্‌কা মেরে নিজেই একা চলে যেতে পারে, সারা শরীর কাঁপছে, রোমকূপ খাড়া হয়ে উঠছে, তার শরীরের বিকার দেখা দিচ্ছে, বাইরে রাগ-ক্রোধমোহ একসঙ্গে ওর সত্তাকে চেতিয়ে দিয়েছে যেন। কালো দুর্বলতার কাছে শেষ পর্যন্ত ধরা দিতে হলো প্রদ্যুম্নকে, কারণ পাপের সঙ্গে জীবন জড়ানো, বিশুদ্ধ একাকিত্ব বলে কিছু নেই। প্রমা প্রদ্যুম্নের সারা শরীরে সাগরের ঢেউ তরঙ্গিত করে বিস্রস্ত বেশবাসে একা খিল খিল করে হেসে উঠলো, গর্জে-ওঠা মোটরের হর্ন তুলে ভয়াল চোখ জ্বালিয়ে চলে গেল, একটু পরে প্রদ্যুম্ন একা বাড়ি ফিরলো অন্ধকারে, আসবার সময় রিনি হাতে চাপা দিয়ে বলেছিল, কেমন লাগল! প্রদ্যুম্ন কোনো কথা বলতে পারে নি। এই অনুষ্ঠানে অনিরুদ্ধকেও দেখতে পেলো, বিনিময় হলো শুধু হাসির। অনিরুদ্ধ স্ত্রীকে নিয়ে এসেছিল সঙ্গে, অনিরুদ্ধের বীভৎস রোগ আর নেই। সে শান্ত স্নিগ্ধ সুসমঞ্জস। রাস্তায় ওর গাড়ির নীচে সলিল মাতাল হয়ে চাপা পড়তে যাচ্ছিল আর একটু হলে, তাকে চিনতে পেরে প্রদ্যুম্ন ওকে বাড়িতে পৌঁছে দিলো, সংবাদপত্রে কাজ করে সংবাদ হয়ে উঠেছে সে।

ঘরে ফিরে জামা কাপড় ছেড়ে বিছানায় শুতেই মনে হলো শরীরে অসহ্য পুলক, তবু তার কোথায় যেন বিষণ্ণ অন্ধকার চুপটি মেরে বসে তাকে কাঁদিয়ে দিচ্ছে, এক ইন্দ্রিয় তাকে প্রমার দিকে নিয়ে যাচ্ছে, মনে হচ্ছে এই রাত্রে একাকী প্রমাকে পেলে তার সমস্ত কিছু চরিতার্থ হয়ে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে বহুদূর অতীত কালের পাপ

স্মৃতি মনে এলো, মনে হলো, বেশ্যার অপূর্ব রঙ্গের মধ্যে হেওয়ার্ডের তীব্রতা শরীরের রোমকূপে ভরে গেছে, তার আকাঙ্ক্ষা বারবার জাগিয়ে তোলে, এই সুখ বারবার তরঙ্গ তুলে শরীরে আনন্দে উন্মথিত। প্রমা প্রমা, প্রদ্যুম্ন অস্ফুট স্বরে কয়েকবার ডাকালো, কিন্তু কোনো সাড়া নেই, অথচ প্রমার জন্য তীব্র বাসনা, তার রক্তের উপাদানে সুলতা এসেছিল, সে কই ; সে-ও এখানে প্রমার সঙ্গে মিশে আছে, আলাদা করা যাচ্ছে না। প্রমা তাকে বারবার জ্বালাচ্ছে, আরো কয়েকবার তার সঙ্গে মিলিত হয়েছে অন্ধকারে, কিন্তু প্রমার তাতে কিছু হয়নি, ওর বাবা শুধু পরোক্ষে প্রস্তাব দিয়েছে বিয়ের জন্যে। স্ত্রী আত্মহত্যা করলে পুরুষের কোনো অপরাধ নেই, কারণ সে হাঁসের মতো জল কেটে উড়ে উড়ে যায়। আদরে ডেকে নিয়ে গিয়ে ছলনায় ভরে দেবার সময় কার্পণ্য করবার অসীমতা সামাজিক রমণীর কর্তব্য, কিন্তু প্রমা ভীষণ দুর্দান্ত। পাপের অন্ধকারে প্রদ্যুম্নের দেহমন যন্ত্রণায় ছটফট করছে অস্থির হয়ে।

তীব্র যন্ত্রণায় হতাশায় দ্বন্দ্বে বিরোধে প্রদ্যুম্ন দু'মাস ছুটি নিয়েছে, কলকাতার বাইরে দূরে, সমুদ্রের ধারে, শূন্যে পাহাড়ে কাটিয়েছে কয়েক-দিন, কিন্তু কোথাও শান্তি পায় নি, স্বস্তি পায় নি, উত্তর পায় নি, প্রমাকে ভুলে সুলতাকে চেয়েছে, সুলতাকে হারিয়ে প্রমাকে খুঁজেছে সে, প্রমা ও সুলতা হৃদয়ে এক, কিন্তু যাকে সে চেয়েছিল, তাকে পায় নি, তার চিত্তের গভীরে সেই অতৃপ্ত গোলাপ হাঁ করে জল প্রার্থনা করেছে শুধু, সেখানে অনাবৃষ্টির প্রখর তাপে সব শুষ্ক, বেদনায় স্রোত কাঁপছে। রাইটার্সে'র ঘরের মধ্যেই আবার আশ্রয় নিলো সে, ঘরটাই এখন সমস্ত লীলা সংবরণ করে জড়পিণ্ডের মতো ঐক্যবদ্ধ স্থির ; তার স্মৃতি, স্বপ্ন, আকাঙ্ক্ষা, ভবিষ্যৎ সবই শূন্যের বাতাসের মতো এই রুদ্ধ ঘরে একা ঘোরে। পায়ের শব্দে, হাওয়ার শব্দে, আলোকের গন্ধে সব একাকার, বাইরের দৃশ্যের সমস্ত ঘটনা প্রদ্যুম্নের ভেতরে খেলা করে, সুলতা মৃত, প্রমাও বিবর্ণ। কিন্তু শরীরের সমস্ত উপাদানের মধ্যে বিকারের ভেতরে গুণ, এর অভ্যন্তরে কর্মের মধ্যে ইচ্ছা ও কামের অন্তর্গূঢ়তা রয়েছে, তাদের আলাদা করা যায় না। অসহ্য

আনন্দ বয়, এই আনন্দ বিস্তারিত হয়ে তার হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষায় পে ৗছয়, কাঁপন লাগে, দুলে ওঠে, সমগ্র শরীর ও মনের মধ্যে হৃদয়ের উপলব্ধির গভীরে বেদনার স্রোত একাকার হয়ে যায়, কোনো ভেদ নেই, কিন্তু সুলতার জন্যে আকাঙ্ক্ষার অতৃপ্তি ষড়ৈশ্বর্যে পূর্ণ হয়ে প্রত্যুম্নকে ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে দূরে। বাইরের সমস্ত কর্ম, বিভেদ, স্বাতন্ত্র্য, লড়াই, মারামারি, বিদ্বেষ হৃদয়ে এসে চিত্রিত; সুলতাকে নিয়ে প্রত্যুম্নের হৃদয়ে ও শরীরে দ্বন্দ্ব বাধিয়েছে, তার পর হারিয়ে গেছে, প্রত্যুম্নের ভেতরে বিশ্বসৃষ্টির উপাদান যেন এখন সংহত, সুলতার সঙ্গে প্রত্যুম্নের আর কোনো বিভেদ নেই, ওর শরীরে মোহের ও কামের মধ্যে যে বিভেদ ছিল, তা সরে গিয়ে আরো গভীরে ঢুকেছে। সৃষ্টি যেমন আবর্তনের মধ্যে সমস্ত উপাদানকে খুইয়ে নতুন শক্তির জন্যে রূপ ধরে, তেমনি করে বাইরের জগতের সমস্ত পার্থক্য স্বাতন্ত্র্য বিভেদ শক্তির প্রচণ্ডতা অন্তর্হিত, প্রত্যুম্নের ভেতরে অদ্ভুত আগুনের লাভা দীপ্যমান, শক্তি সঞ্চিত হচ্ছে, হয়তো বাইরে আবার তার বিচিত্র প্রকাশ ঘটবে, কিন্তু তার আগে প্রত্যুম্ন সব কিছুকে আপনার একান্ত অন্ধকারের গোপনে পেয়ে গভীর আনন্দে সুখে আন্দোলিত; সেখানে সব শক্তি জেগে আছে, বাইরে তাকাবার প্রয়োজন নেই। এখানেই প্রকৃত মুক্তি। সুলতা ও প্রত্যুম্ন নদীর তীরে বালির ওপর গভীর বনের ধারে পাতার রঙিন হাওয়ায় নীল আকাশের নীচে পাখির গানের সুরে একসঙ্গে মিলনের আনন্দে ছুটোছুটি করছে, রক্তপিণ্ডের মত জড়িয়ে নয়। ফিরে-পাওয়া হারানো নিবিড় অন্ধকারে হঠাৎ তার বাসুদেবের কথা মনে হলো, সে মৃত্যু-শয্যায়।

পুঞ্জিত গোপন ধ্বনির সুরের সমারোহে নিভৃত বেদনার নম্র নীল শিখা ব্যথিয়ে উঠেছে সমস্ত হৃদয়ে, আবেশে চঞ্চল ব্যাকুলতা। এর থেকে প্রত্যুম্ন বেরিয়ে আসতে চায়, ইন্দ্রিয়ের কৃষ্ণচূড়ায় চৈত্রদিনে বাতাসে উষার আলো কাঁপতে থাকে।